অমর একুশে সংখ্যা

ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ■ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৩

সচিত্র বাংলাদেশ

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা

মহান ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 37, No. 8 February 2017, Tk. 25.00

সচিত্র বাংলাদেশ

ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ■ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৩

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ

ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ■ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৩

একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধার ফুলে ফুলে ভরে গেছে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার বেদি

সম্পাদকীয়

একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ মাতৃভাষার মর্যাদা আদায়ের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল ছাত্র-জনতা। পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক, সফিকসহ আরো অনেকে। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭-এর প্রাক্কালে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। অমর একুশ আমাদের জাতিসত্তার প্রেরণার উৎসস্থল। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের চেতনার প্রথম উন্মেষ ঘটে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করে এবং ২০০০ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। এভাবে আমাদের মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের অধিকারের প্রতীকে পরিণত হয়। আজ আমাদের সাথে বিশ্ববাসীও অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে পালন করছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সংখ্যায় একাধিক প্রতিবেদন রয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র মেয়াদ শেষে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) গৃহীত হয়। এসডিজি'র এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। মোট ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১১টি অভীষ্টের ধারণা বাংলাদেশই দিয়েছে। এতে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যও সারাবিশ্বে প্রশংসিত। এসডিজি'র ১৬৯টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বাংলাদেশের জন্য ১৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা প্রযোজ্য। বাংলাদেশ সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় এসডিজিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য ১৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্ণাঙ্গ কর্মকৌশল প্রণয়ন করে তা অনুসরণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করেছে। এর ওপর একটি নিবন্ধ রয়েছে এই সংখ্যায়।

এবারো *সচিত্র বাংলাদেশে* স্থান পেয়েছে গল্প, কবিতাসহ নিয়মিত অন্যান্য বিষয়। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

শিল্প নির্দেশক
সঞ্জিব কুমার সরকার

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুবর্ণা শীল
নাহ্‌রীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহকারী
মো. জাকির হোসেন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৯৩৩৩১২০, ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

মহান ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান ৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন

ধর্মগ্রন্থে ভাষা প্রসঙ্গ ৬
ড. মুহাম্মদ আবদুল হাননান

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা ৯
ফয়সাল শাহ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) ১৪
সম্পাদকীয় বিভাগ

একুশের কারা-নির্যাতিত নারী ৩২
বাশার খান

বাংলা একাডেমি ও একুশে বইমেলা ৩৫
ইলিয়াছ হোসেন পাভেল

বাংলা ভাষা : অতীত ও বর্তমান ৩৭
ম. মীজানুর রহমান

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ৪০
আ. শ. ম. বাবর আলী

গল্প

লুকোচুরি ৪১-৪৩
নাসিম সুলতানা

কবিতাগুচ্ছ ৪৪-৪৭

জাফরুল আহসান, মোশাররফ হোসেন ভূঞা, নাছিমা বেগম, রাবেয়া সুলতানা, বাতেন বাহার, জাকির হোসেন চৌধুরী, জাকির আবু জাফর, ফরিদ আহমেদ হৃদয়, মিলি হক, নাহার আহমেদ, মনসুর জোয়ারদার, কনক চৌধুরী, মাজেদুল হক, সানোয়ার শান্তি, এস এম শহীদুল আলম

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি	৪৮
প্রধানমন্ত্রী	৪৮
তথ্যমন্ত্রী	৫০
আমাদের স্বাধীনতা	৫০
জাতীয় ঘটনা	৫১
উন্নয়ন	৫২
শিক্ষা	৫৩
জেন্ডার ও নারী	৫৪
স্বাস্থ্যকথা	৫৪
সংস্কৃতি	৫৫
ডিজিটাল বাংলাদেশ	৫৬
কৃষি	৫৭
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৫৭
যোগাযোগ	৫৮
পরিবেশ ও জলবায়ু	৫৯
সামাজিক নিরাপত্তা	৫৯
নিরাপদ সড়ক	৬০
শিল্প-বাণিজ্য	৬১
প্রতিবন্ধী	৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন	৬২
আন্তর্জাতিক	৬২
চলচ্চিত্র	৬৩
ক্রীড়া	৬৪

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: dfpsb@yahoo.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা

মহান ভাষা আন্দোলন বাঙালির জীবনে সবচেয়ে তাৎপর্যময় ঘটনা। বাঙালির পরবর্তী ইতিহাস–বিশেষ করে আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচক হিসেবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে আখ্যায়িত করা যায়। রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার জন্য আন্দোলন এবং তার পরবর্তী স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের পরিণতি হচ্ছে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পথ বেয়েই একদিন বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভাব ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৯।

মহান ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন মাত্র ২৭ বছরের যুবক। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর বর্ধমান হাউজে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। সভা চলাকালে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের একটি মিছিল সেখানে উপস্থিত হয়। এই মিছিলে অন্যান্যদের সঙ্গে শেখ মুজিবও উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল দিন। এ দিন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ থেকে ১০ মার্চ রাতে ঢাকায় আসেন। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৪।

ধর্মগ্রন্থে ভাষা প্রসঙ্গ

বিশ্বে তালিকাভুক্ত ভাষার সংখ্যা ৬০৬০টি। এর মধ্যে মাত্র ৩০০ ভাষা দিয়েই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কথা বলার কাজটি হয়ে যাচ্ছে। ৫০টির মতো ভাষা আছে, যে ভাষাগুলোতে মাত্র ১ জন করে মানুষ কথা বলে। ৫০০টির মতো ভাষা পৃথিবীতে আছে, যার মাধ্যমে কথা বলে মাত্র ১০০ জন করে লোক। চীন এতবড়ো দেশ, শতকোটিরও বেশি মানুষের বাস, সেখানে ভাষা মাত্র ২০৫টি। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে চালু আছে ৪০৭টি ভাষা। কম করে হলেও ৩০টি ভাষা প্রচলিত রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে। পৃথিবীর এতগুলো ভাষা, এ ভাষাগুলো কেমন করে এক থেকে অন্যে ভিন্ন হলো, তার নানারকম ব্যাখ্যা ভাষাবিদদের কাছে রয়েছে। এ সম্পর্কে ধর্ম গ্রন্থ তৌরাত শরিফ, ইঞ্জিল শরিফ ও কোরান শরিফ থেকে কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এ বিশেষ নিবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৬।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)

জাতিসংঘের উদ্যোগে সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সর্বজনীনভাবে একগুচ্ছ সমন্বিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এতে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র মেয়াদ শেষে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) গৃহীত হয়। এসডিজি'র সংশ্লিষ্টতা ও ব্যাপকতা এমডিজি'র চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এসডিজি'র সফল বাস্তবায়নের মধ্যে। এসডিজি'র সফলতার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসমূহ মোকাবিলা করে একটি টেকসই ও নিরাপদ বিশ্ব আগামী ১৫ বছরের মধ্যে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর ওপরে বিস্তারিত দেখুন, পৃষ্ঠা-১৪।

নিবন্ধ

মহান ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান

খালেক বিন জয়েনউদদীন

মহান ভাষা আন্দোলনের গৌরব ও ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর এক অনন্য দিন মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের এদিন বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা মাতৃভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে গায়ের রক্ত ঢেলে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত করেছিল। একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু অনন্য দিনই নয়, বাঙালির প্রথম জেগে ওঠার সকল প্রাপ্তির দিন। এই প্রাপ্তির পথ ধরেই সকল আন্দোলন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। আমরা গৌরব ও অহংকারের সাথে বলতে পারি–বাংলা মায়ের দামাল ছেলের তাজা রক্ত বৃথা যায়নি। মাতৃভাষা আন্দোলনের অস্তিত্ব রক্ষার সেই সংগ্রামকে দীর্ঘ ৪৭ বছর পর জাতিসংঘের ইউনেস্কো স্বীকৃতি প্রদান করে গোটাবিশ্বকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের আহ্বান জানায়। ফলে একুশ এখন গোটা বিশ্বের মাতৃভাষাপ্রেমী মানুষের কাছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভাষা আন্দোলনের রক্তে রাঙানো বর্ণগুলো এখন প্রবাসী বাঙালিদের বদৌলতে শিমুল-পলাশের রং ছড়াচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের সৈন্যদের ইতিবাচক অবদানের ফলে আফ্রিকার সিয়েরালিওনের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সেদেশের ছেলেমেয়েরা বাংলা ভাষাকে মর্যাদা সহকারে শিখেছে এবং ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে জীবন গড়ে তুলছে। এ আমাদের পরম প্রাপ্তি।

বাংলা ভাষার অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার সেই আন্দোলন একদিনে সংগঠিত হয়নি। এ আন্দোলনের রয়েছে জাতিগত ইতিহাস ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। আমাদের সকলেরই জানার কথা-উপমহাদেশে প্রায় দুইশ বছর রাজত্ব শেষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বিলেতে রাজা-মহারানিরা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। অবশ্য এজন্য তিতুমীর ও ফকির-মজনু শাহ্‌র বিদ্রোহ, ফরায়েজি আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, স্বদেশি ও অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি নানারকম আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে। ঝরেছে এ ভূখণ্ডের বহু অমূল্য প্রাণ। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত ভাগ হলো দুই ভাগে, দ্বিজাতিতত্ত্বে সৃষ্টি হলো পাকিস্তান। সিলেট, কাশ্মির ও হায়দারাবাদ এবং পাঞ্জাব-এর সীমানা প্রশ্নের মীমাংসা হলো। মীমাংসা হলো না পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ : প্রভাতফেরিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

অবশ্য ভারত ভাগের প্রাক্কালে ৩ জুলাই আলীগড় (মুসলিম) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ কোনোকিছু না ভেবেই বললেন, 'ভারতে যেমন হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে, পাকিস্তানে তেমনই উর্দু রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত'। ভাবতে অবাক লাগে এমন দায়িত্বশীল ব্যক্তি কী করে এমন অবাস্তব বক্তব্য দিলেন। পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলের কোনো মানুষের তখন মাতৃভাষা উর্দু নয়। উর্দু একটি মিশেল ভাষা। সেকালে ভারতের বিহার প্রদেশের হিন্দু-মুসলমানের জবানি ভাষা। স্বাধীনতাকালে পাকিস্তানের ভাষাভাষী জনগণ ছিল বাঙালি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি ও বেলুচি। এক অর্থে সিংহভাগ মানুষ বাঙালি এবং তাদের ভাষা বাংলা। ড. জিয়াউদ্দীনের এই বক্তব্য শুনে পূর্ব বাংলার সচেতন মানুষ ক্ষুব্ধ হলো ঠিকই। প্রখ্যাত ভাষাপণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে জিয়াউদ্দীনের বক্তব্য খণ্ডন করে ১৯৪৭ সালে 'পাকিস্তানে ভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এটি মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত *দৈনিক আজাদে* প্রথম ছাপা হয়। পরে পুস্তিকাকারে রেনেসাঁস প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা ও লিপি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার আহ্বান জানান। এই প্রবন্ধটি পড়ে অনেকেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে সাধুবাদ জানান এবং অনেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এই সময় তরুণ নেতা শেখ মুজিব এবং তাঁর দুই ছাত্রলীগ কর্মী সৈয়দ আনোয়ার ও নইমুদ্দীনকে নিয়ে সাক্ষাৎ করেন। ঐ পুস্তিকাটি সর্বস্তরে বিতরণের উদ্দেশ্যে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলনের সেই সূচনা পর্বে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন তমুদ্দুন মজলিশের জ্যেষ্ঠ নেতৃবর্গ।

কিন্তু পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ পন্থিরা কোনো প্রতিবাদই জানাননি। বরং জিন্নাহ ও নাজিমুদ্দীন উপাচার্যের বক্তব্যের রেশ ধরে ঢাকায় এসে সভা ও সম্মেলনে বললেন, উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এ পর্যায়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দু ভাষার ওকালতি করলে পূর্ব বাংলার মানুষ ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। এ সময় বাংলা ভাষার পক্ষে এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা না করার প্রতিবাদে লেখালেখি শুরু হয়। অনেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন। এ অভিমতগুলোই ভাষা আন্দোলনের প্রথম স্ফুরণ। মোটাদাগে মহান ভাষা আন্দোলনের দুটি পর্ব। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৮-এর মার্চ পর্যন্ত সূচনা পর্ব এবং চূড়ান্ত পর্ব ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি। যার রেশ বা প্রভাব ৫৪, ৬৬, ৬৯, ৭০ ও ৭১ -এর বিজয় পর্যন্ত। এখন ভাষা আন্দোলনের প্রথম

স্ফুরণের কিছু অভিমত তুলে ধরছি। যা আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উৎসাহ জোগায়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি নিবন্ধে লেখেন–'উর্দু বহিয়া আনিবে পূর্ব পাকিস্তানিদের মরণ। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মৃত্যু। রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় পশ্চিম পাকিস্তানি উর্দুওয়ালাদের শাসন-শোষণের ক্ষেত্র।' কাজী মোতাহার হোসেন উর্দুকে চাপিয়ে দেবার বিরোধিতা করে বলেন, শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবনতি হবার আশঙ্কা আছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আবার বলেন, ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। তখনকার *সাপ্তাহিক মিল্লাতের* সম্পাদকীয়তে বলা হয়: একটি দেশকে পুরোপুরি দাসত্বে রূপান্তরিত করার সাম্রাজ্যবাদীদের যত রকম অস্ত্র আছে, তার মধ্যে সবচাইতে ঘৃণ্য ও মারাত্মক হইতেছে সেই দেশের মাতৃভাষার পরিবর্তে একটি বিদেশি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। *দৈনিক আজাদের* সম্পাদকীয়তে বলা হয়-যে দিক দিয়েই বিবেচনা করা হোক না কেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবিই সবচেয়ে বেশি। এভাবেই ভাষা অন্দোলনের এবং বাংলা ভাষার স্বপক্ষে অভিমত ও বক্তব্য বাঙালির হৃদয়ে স্ফুরণ ঘটায়।

এবার ভাষা আন্দোলনের গোড়ার দিকে চোখ ফেরানো যাক। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে মুসলিম লীগের বামপন্থি নেতারা গণ আজাদী লীগ গঠন করেন এবং তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়–বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব পাকিস্তানিদের ভাষা হবে বাংলা। এ সময় গণ আজাদীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ (বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী)। পরবর্তী সময় শেখ মুজিব কলকাতা থেকে এসে গণ আজাদী লীগের প্রতি সমর্থন জানান।

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আবুল কাশেম-এর নেতৃত্বে তমুদ্দুন মজলিশ গঠিত হয় এবং ১৫ সেপ্টেম্বর তমুদ্দুন মজলিশের নেতারা বাংলা ভাষাকে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে শিক্ষা সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আরবি হরফে বাংলা লেখার কথা বললে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভুঞা ছিলেন এর আহ্বায়ক। এই সংগ্রামকারীদের দাবির পক্ষে থানায় থানায়, বাড়ি বাড়ি ঘুরে সেকালে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে দিয়েছিল ২৭ বছরের যুবক শেখ মুজিব।

১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর বর্ধমান হাউজে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। এ সভায় বাংলা ভাষা সম্পর্কে কমিটির মতামত নেওয়া হয়। বৈঠক চলাকালে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের একটি মিছিল সেখানে উপস্থিত হয়। এই মিছিলে অন্যান্যদের সঙ্গে শেখ মুজিবও উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে একাত্তরে শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি-উর্দুর সাথে বাংলা ভাষাকে ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এর তীব্র বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্যের বিরোধিতাও করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয় এবং ২ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কামরুদ্দীন আহমেদ। সংগ্রাম পরিষদে গণ আজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুব লীগ, তমুদ্দুন মজলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ সভাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হবে।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল দিন। এই দিন সম্পর্কে ভাষাসৈনিক ও রাজনীতিবিদ অলি আহাদ তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন, 'আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবার নিমিত্ত শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ হইতে ১০ মার্চ রাত্রে ঢাকায় আসেন। সকাল নয়টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুল ওয়াদুদ ও আমি সেক্রেটারিয়েট ভবনের প্রথম গেটে উপস্থিত হই। তখনও সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীবৃন্দ আসেন নাই। ইতোমধ্যে তরুণ জননেতা জনাব শামসুল হক কয়েকজন কর্মীসহ আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, তিন হইতে পাঁচজন সেক্রেটারিয়েটের গেটগুলির প্রত্যেকটিতে পিকেটিং করিব এবং এক গ্রুপ ধরা পড়িলে পরবর্তী গ্রুপ পিকেটিং করিবে। বেলা ৯টা ৩০ মিনিট হইতে ১০টার মধ্যে সেক্রেটারিয়েটগামী কর্মচারীদিগকে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বাধা দিতে শুরু করিলাম। সিটি এস.পি আবদুল গফুরের হুকুমে পুলিশ তৎপর হইয়া উঠিল। ইংরেজ ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মি. চ্যাথাম লাঠি চালানোর আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শামসুল হক ও তাঁহার গ্রুপের কতিপয় কর্মী গ্রেফতার হইলেন। ইহার পর শেখ মুজিবুর রহামান আর এক গ্রুপসহ গ্রেফতার হইলেন। পুলিশবাহিনী অধৈর্য হইয়া উঠিল এবং বেপরোয়া লাঠি চালানো আরম্ভ করিল'।

১১ মার্চ যে নির্যাতন হয়েছিল তার প্রতিবাদে ১২ মার্চ বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। ফলে ১৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং ১৪ মার্চ পূর্ব বাংলার সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং ১৫ মার্চ সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এদিকে ১১ মার্চ সরকারের পার্লামেন্টারি বৈঠক চলাকালে ধৃত ছাত্র ও নেতাদের মুক্তির দাবিতে বর্ধমান হাউজের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ১৫ মার্চের আহুত হরতালের কথা চিন্তা করে সরকার ঐ দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে একটি চুক্তি করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে পূর্বে জেলখানায় আটক নেতাদের মুক্তির প্রয়োজন হয় এবং তাদের এটি দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য শেখ মুজিব, শামসুল হক, শওকত আলী, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ চুক্তির শর্তাবলি দেখেন এবং তা সমর্থন করেন ও অনুমোদন করেন। পরে তা যথারীতি স্বাক্ষরিত হয়। ১৫ মার্চ অন্যান্যদের সাথে শেখ মুজিবও মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা আমাদের সকলের জানা। এই আন্দোলন প্রসঙ্গে অলি আহাদ আরো লিখেছেন–শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন। চিকিৎসার কারণে সরকার তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। প্রহরী পুলিশের ইচ্ছাকৃত নির্লিপ্ততার সুযোগ গ্রহণ করে আমরা তার সহিত হাসপাতালে কয়েক দফা দেখা করি। ঐসময় শেখ মুজিব বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে ১৭ দিন ধরে অনশন করে আসছিলেন। সালাম, বরকত, জব্বার ও রফিকদের পুলিশী হত্যার কথা শুনে এক বিবৃতিতে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। এরপরে সরকার তাকে ফরিদপুরের জেলে সরিয়ে নেয়।

মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম ভাষাসৈনিক অলি আহাদ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য ও সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, ভাষা আন্দোলনের গোড়া অর্থাৎ সূচনা পর্ব থেকে '৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। শুধু তাই নয়, ২০১২ সালে প্রকাশিত *বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পড়েও এসব তথ্য আমরা জানতে পারি। বইটির ৯১-১০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তারপরও ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ উঠলেই এ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা অনেকে বেমালুম ভুলে যান। মিথ্যার বেসাতি ইতিহাস কখনো ধারণ করে না।

মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে আমরা আরো গর্ব করতে পারি। বাংলা ভাষাভাষী গোটা বিশ্বের মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুই প্রথম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দিয়ে বাঙালির মাতৃভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে চলেছেন। ভাষা আন্দোলনের সফলতা কারো একক প্রচেষ্টায় অর্জিত হয়নি। যারা আত্মদান করেছেন, তাঁরা বাংলা মায়ের সূর্য সন্তান। আর যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন, পাকিস্তানি নির্যাতন ভোগ করেছিলেন, তাঁরা ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্বের দীপ্র অভিযাত্রী। বঙ্গবন্ধু এ অভিযাত্রার অন্যতম নাবিক। তাই সকল ভাষা-সৈনিকদের আমাদের প্রতিবছর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয়।

লেখক : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

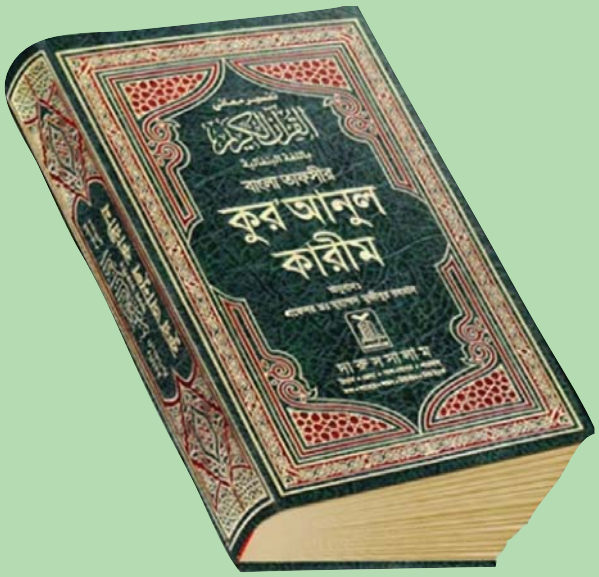

ধর্মগ্রন্থে ভাষা প্রসঙ্গ

ড. মুহাম্মদ আবদুল হাননান

বর্তমান দুনিয়ায় কতগুলো ভাষা আছে, আর কতগুলো ভাষায় মানুষ কথা বলে, এর সঠিক পরিসংখ্যানটি হয়ত পাওয়া যাবে না। কারণ প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একটি করে ভাষা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে মানে, এসব ভাষায় কথা বলার আর একজনও লোক থাকছে না। আগামী ১০০ বছরে পৃথিবী থেকে ৩০০০ ভাষা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন ভাষাবিদরা। [সূত্র : Ethnologue The Languages of the world, ১৯৯৯]। সে হিসেবে গড়ে প্রতি দু'সপ্তাহে একটি করে ভাষা অবলুপ্ত হয়ে যাবে অথবা যাচ্ছে।

দুনিয়ায় তালিকাভুক্ত ভাষার সংখ্যা ৬০৬০টি। এর মধ্যে মাত্র ৩০০ ভাষা দিয়েই দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কথা বলার কাজটি হয়ে যাচ্ছে। ৫০টির মতো ভাষা আছে, যে ভাষাগুলোতে মাত্র ১ জন করে মানুষ কথা বলে। এর অর্থ, ঐ ১ জন করে মানুষের মৃত্যু হলে ৫০টি ভাষারও মৃত্যু হয়ে যাবে। ৫০০টির মতো ভাষা পৃথিবীতে আছে, যার মাধ্যমে কথা বলে মাত্র ১০০ জন করে লোক। ঐ ১০০ জনের মৃত্যু হলে মৃত্যু হবে আরো ৫০০টি ভাষার।

দুনিয়ার ভাষাগুলোর অবস্থান দৈশিক নয়, তা জাতিগত, সম্প্রদায়গত এবং গোষ্ঠীভুক্তও । পাপুয়া নিউগিনি নামে বিশ্বে একটি রাষ্ট্র আছে, যা এমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেই একটি দেশে ৮১৭টি ভাষা চালু রয়েছে কথা বলার জন্য। অথচ চীন এত বড়ো দেশ, শত কোটিরও বেশি মানুষের বাস, সেখানে ভাষা মাত্র ২০৫টি। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে চালু আছে ৪০৭টি ভাষা। [তথ্যসূত্র : এ জেড এম আবদুল আলী: বিশ্বের ভাষা নিয়ে কথা, একুশে ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস শীর্ষক পুস্তিকা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০১]।

আর আমাদের বাংলাদেশে ভাষার সংখ্যা কত? আমাদের জানা আছে কি? কম করে হলেও প্রায় ৩০টি ভাষা প্রচলিত রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে। সংখ্যা দিয়ে একটি তালিকা দেখানো যায়। যেমন, ১. বাংলা ২. চাকমা ৩. মারমা ৪. ওঁরাও ৫. ত্রিপুরা ৬. গারো ৭. লুসাই ৮. সাঁওতালী ৯. মণিপুরি ১০. রাখাইন ১১. রামর‍্যে ১২. মারৌ ১৩. কুরুক ১৪. ককবরক ১৫. হাল্লামী ১৬. নাইতুং ১৭. ফাতুং ১৮. উসুই ১৯. আচিক ২০. কুচিক ২১. মান্দি কুচিক ২২. আবেং ২৩. সাগেতাং ২৪. আত্তং ২৫. দুলি এ্যানটং ২৬. কারমেলি ২৭. মাহলেস, ২৮. মণিপুরি মৈতৈ ২৯. খালাছাই।

এই ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ছাড়া অন্য ভাষাগুলোর কিছু কিছু নামেই আলাদা আলাদা দেখানো হয়, একের সঙ্গে অন্যের পারস্পরিক অনেক মিল রয়েছে অনেকক্ষেত্রে। আবার সামান্য কিছু পার্থক্যের জন্য নৃগোষ্ঠীর ভাষাগুলোর আলাদা আলাদা নাম হয়েছে।

পৃথিবীর এতগুলো ভাষা, এ ভাষাগুলো কেমন করে এক থেকে অন্যে ভিন্ন হলো, তার নানারকম ব্যাখ্যা ভাষাবিদদের কাছে রয়েছে। তবে এ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রন্থ তৌরাত শরিফ, যা মুসা আ. -এর আমলে নাজিল হয়েছিল (যদিও মূল তৌরাত শরিফ পাওয়া এক কঠিন কাজ), তার থেকে কিছু তথ্য নেওয়া যায়। তৌরাত শরিফ-এ ভাষার জন্মকথা নিয়ে একটি ছোট্ট অধ্যায় রয়েছে। এতে বলা হয়েছে,

> তখনকার দিনে সারা দুনিয়ার মানুষ কেবল একটি ভাষাতেই কথা বলত এবং তাদের শব্দগুলো ছিল একই। পরে তারা পূর্বদিকে এগিয়ে যেতে যেতে ব্যাবিলন দেশে একটা সমভূমি পেয়ে সেখানেই বাস করতে লাগল।...
>
> তারা বলল, 'এস, আমরা নিজেদের জন্য একটা শহর তৈরী করি এবং এমন একটা উঁচু ঘর তৈরী করি যার চূড়া গিয়ে আকাশে ঠেকবে।...
>
> মানুষ যে শহর ও উঁচু ঘর তৈরী করছিল তা দেখবার জন্য মাবুদ নেমে আসলেন। তিনি বলেছিলেন, এরা একই জাতির লোক এবং এদের ভাষাও এক; সে জন্যেই এই কাজে তারা হাত দিয়েছে। নিজেদের মতলব হাসিল করবার জন্য এরপর এরা আর কোন বাধাই মানবে না। কাজেই এস, আমরা নীচে গিয়ে তাদের ভাষায় গোলমাল বাধিয়ে দিই যাতে তারা একে অন্যের কথা বুঝতে না পারে।
>
> তারপর মাবুদ সেই জায়গা থেকে তাদের সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিলেন। এতে তাদের সেই শহর তৈরীর কাজও বন্ধ হয়ে গেল। এই জন্য সেই জায়গার নাম হল ব্যাবিলন, কারণ সেখানেই মাবুদ সারা দুনিয়াতে ভাষার মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিলেন। [তৌরাত শরীফ: পয়দায়েশ, সূত্র : কিতাবুল মোকাদ্দস, বিবিএস, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১২]।

[মূল তৌরাত শরিফ-এ একথাগুলো কেমন করে ছিল তা আজ আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব হবে না। তবে বাইবেল সোসাইটি অনূদিত ও প্রচারিত এ তৌরাত শরিফ নিঃসন্দেহে শ্রষ্ঠার প্রতি বিদ্বেষমূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে। বান্দারা কী শহর ও ঘরবাড়ি তৈরি করেছে তা দেখার জন্য আল্লাহর নিচে নেমে আসার প্রয়োজন নেই। আর, 'এস, আমরা নীচে গিয়ে তাদের ভাষায় গোলমাল বাধিয়ে দিই'– এমন বাক্য আল্লাহর হতে পারে না। 'গোলমাল' একটি নেতিবাচক শব্দ, আল্লাহ এভাবে কথা বলবেন না। আর শেষ লাইনটিও আপত্তিকর মন্তব্য দ্বারা পূর্ণ। বলা হয়েছে, 'মাবুদ সারা দুনিয়াতে ভাষার মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিলেন'। এ লাইন পড়ে আল্লাহ বা মাবুদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা হবে না, বরং নেতিবাচক ধারণা জন্ম নেবে। ভাষা প্রসঙ্গে তৌরাত শরিফের নামে এ ভাষ্য বিভ্রান্তিমূলক।]

এরপর আমরা দেখতে পারি ভাষা প্রসঙ্গে ইঞ্জিল শরিফের ভাষ্য। ইঞ্জিলের করিন্থীয় ভাষ্যে যিশু বলেছেন,

> ১. আমি যদি মানুষের এবং ফেরেশতাদের ভাষায় কথা বলি

কিন্তু আমার মধ্যে মহব্বত না থাকে, তবে আমি জোরে বাজানো ঘণ্টা বা ঝনঝন করা করতাল হয়ে পড়েছি। যদি নবী হিসাবে কথা বলবার ক্ষমতা আমার থাকে, যদি আমি সমস্ত গোপন সত্যের বিষয় বুঝতে পারি, আর যদি আমার সবরকম জ্ঞান থাকে... কিন্তু আমার মধ্যে মহব্বত না থাকে, তবে আমার কোনই মূল্য নেই। [ইঞ্জিল শরিফ, সপ্তম খণ্ড, করিন্থীয় ভাষা, সূত্র : কিতাবুল মোকাদ্দস, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৪২-২৪৩]।

অন্যত্র, যিশুরই ভাষ্যে,

২. ...অন্য কোন ভাষায় যে লোক কথা বলে সে মানুষের কাছে কথা বলে না কিন্তু আল্লাহর কাছে কথা বলে, কারণ কেউ তা বুঝতে পারে না। [সূত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৩]।

৩. আমি চাই যেন তোমরা সকলেই বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পার। কিন্তু আরও বেশী করে চাই যেন তোমরা নবী হিসেবে কথা বলতে পার। [সূত্র : পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা ২৪৩]।

৪. অন্য কোন ভাষায় যে লোক কথা বলে, জামাতের লোকদের গড়ে তুলবার জন্য যদি সে তার কথার মানে বুঝিয়ে না দেয়, তবে তার চেয়ে নবী হিসাবে যে কথা বলে সে-ই বরং বড়। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৩]।

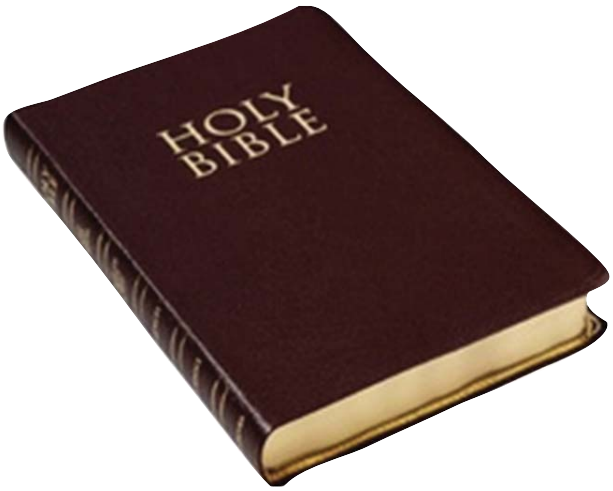

৫. এজন্য অন্য কোন ভাষায় যে লোক কথা বলে সে মুনাজাত করুক যেন তার মানে সে বুঝিয়ে দিতে পারে। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৩]।

৬. আমি যদি অন্য কোন ভাষায় মুনাজাত করি তবে আমার রূহই মুনাজাত করে কিন্তু আমার মন কোন কাজ করে না। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৩]।

৭. ... তা না হলে যদি তুমি রূহে আল্লাহকে শুকরিয়া জানাও তবে সেই ভাষা বুঝতে পারে না এমন কোন লোক যদি সেখানে উপস্থিত থাকে, তবে সে কেমন করে তোমার শুকরিয়াতে আমিন বলে সায় দেবে ? সে তো জানে না তুমি কি বলছ। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৩]।

৮. আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে বেশী পারি বলে আল্লাহকে শুকরিয়া জানাই। তবে জামাতের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় হাজার হাজার কথা বলবার বদলে অন্যদের শিক্ষা দেবার জন্য আমি বুদ্ধি দিয়ে বরং মাত্র পাঁচটা কথা বলব। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৩]

৯. ... ঈমানদারদের জন্য বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা কোন চিহ্ন নয়, বরং অ-ঈমানদারদের জন্য ওটা একটা চিহ্ন। [সূত্র : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৪]।

১০. জামাতের সমস্ত লোক এক জায়গায় মিলিত হলে পর যদি সবাই বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে থাকে আর তখন সেই জামাতের বাইরের লোকেরা এবং অ-ঈমানদারেরা ভিতরে আসে, তবে কি তারা তোমাদের পাগল বলবে না। [সূত্র: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৪]

ইঞ্জিল শরিফের এ সুক্তগুলোর কোনো ব্যাখ্যা এ গ্রন্থে নেই। ফলে ভাষা বিষয়ে এখানকার উপস্থাপিত জটিল বাক্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য বের করা যাচ্ছে না। শুধু এটুকু বলা যায় অথবা ভাবা যায়, বিভিন্ন রকম ভাষা সেই প্রাচীন আমলেই দুনিয়াতে ছিল।

পবিত্র কোরানেও ভাষা প্রসঙ্গে নানা আয়াত রয়েছে। প্রথমে আমরা দেখব ৩০ নম্বর সূরা রুম-এর ২২ নম্বর আয়াত। এতে বলা হচ্ছে,

> তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলির মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের (মানুষের) ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানী লোকদের জন্য অবশ্যই দৃষ্টান্ত রয়েছে।

অন্যত্র, সূরা ইব্রাহিম-এর আয়াত ৪ :

> আমি (আল্লাহ) প্রত্যেক রসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাঁরা (রসুলরা) যাতে (আমার কথা) খোলামেলাভাবে তাদের (লোকদের) কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে।...আল্লাহই শক্তিমান ও তত্ত্বজ্ঞানী। [সূরা ইব্রাহিম, আয়াত নম্বর ৪]।

নবি মোহাম্মদ সা.-এর সাহাবীদের মধ্যে কোরানের তাফসিরকার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. প্রথমে উদ্ধৃত সূরা রুমের আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,

> ...এবং তাঁর একত্ববাদ ও কুদরতের নির্দেশনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা যেমন আরবি, ফার্সি ইত্যাদি ও বর্ণের বৈচিত্র্য, যেমন লাল, কালো ইত্যাদি। [তাফসীরে ইব্ন আব্বাস, তৃতীয় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ২৪-২৫]।

বর্তমান জামানার কোরানের তাফসিরকার মুফতি শাফী র. এ আয়াতের তাফসিরে উল্লেখ করেছেন,

> খোদায়ী কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন... হচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণ-বৈষম্য; যেমন কোন স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষার বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবী, ফারসী, হিন্দী, তুর্কী, ইংরেজী ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন ভাষা পরস্পর এত ভিন্নরূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না।
>
> স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহতাআলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের

কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বরের সাথে পুরোপরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে।...

এমনিভাবে বর্ণ-বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতামাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। [মুফতি শাফী র.-এর তাফসিরকৃত পবিত্র কোরআনুল করীম, মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হিজরি, পৃষ্ঠা ১০৪১-১০৪২]।

ইব্ন আব্বাস রা. তাঁর তাফসিরে শেষোক্ত সূরা ইব্রাহিমের দুটো ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, ১. আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি। তার আপন সম্প্রদায়ের ভাষাসহ পাঠিয়েছি, তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যে, তাদের ভাষায় যা তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং নিষেধ করা হয়েছে। ২. অপর ব্যাখ্যায়, এমন ভাষাসহ রাসুল প্রেরণ করেছি যে ভাষার দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বুঝে নিতে সক্ষম হয়। [তাফসীরে ইব্ন আব্বাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৫৬]।

আধুনিক জামানার কোরান তাফসিরকার মুফতি মুহাম্মদ শাফী র. তাঁর তাফসিরে উল্লেখ করেন,

> বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শত শত ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এমতাবস্থায় সবাইকে হেদায়েত করার দুটি মাত্র উপায় সম্ভবপর ছিল। এক. প্রত্যেক জাতির ভাষায় পৃথক পৃথক কোরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং রসুলুল্লাহ সা.-এর শিক্ষাও তদ্রূপ প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। আল্লাহর অপার শক্তির সামনে এরূপ ব্যবস্থাপনা মোটেই কঠিন ছিল না, কিন্তু সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে এক রসুল, এক গ্রন্থ, এক শরীয়ত প্রেরণ করার মাধ্যমে হাজারো মতবিরোধ সত্ত্বেও ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের যে মহান লক্ষ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল, এমতাবস্থায় তা অর্জিত হত না।...
>
> তাই দ্বিতীয় পন্থাটিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা এই যে, কোরআন একই ভাষায় অবতীর্ণ হবে এবং রসুলের ভাষাও কোরআনের ভাষা হবে। এরপর অন্যান্য দেশীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ প্রচার করা হবে। [পবিত্র কোরআনুল করীম, মুফতি শাফী র.-এর তাফসীর, মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হিজরি, পৃষ্ঠা ৭১১-৭১২]।

মানুষকে আল্লাহতাআলা ভাব প্রকাশ করতে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর কথা কোরআনের আরো নানা সূরায় প্রকাশিত হয়েছে। সূরা আর রহমান-এর প্রথমেই আল্লাহতাআলার বর্ণনা :

> পরম করুণাময় আল্লাহ। তিনিই কোরান শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনি তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন। [অনুবাদ, বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : কোরান শরিফ সরল বঙ্গানুবাদ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪০৩]।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর তাফসির করেছেন,

> তিনিই (আল্লাহ) তাকে (মানুষকে) শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে। আল্লাহতাআলা মানুষকে সবকিছু বর্ণনা করতে শিখিয়েছেন এবং পৃথিবীর সকল জীব-জন্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। [তাফসীরে ইব্ন আব্বাস, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৬]।

মুফতি শাফী র. এর তাফসির করেছেন আরো ব্যাপকভাবে। তিনি উল্লেখ করেছেন,

> মানব সৃষ্টির পর অসংখ্য অবদান মানবকে দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।... প্রথমে কোরআন শিক্ষা ও পরে বর্ণনা শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে।... এখানে বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা, লেখা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বর্ণনা এবং অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহতাআলা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বাকপদ্ধতি সবই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ... । [মুফতি শাফী র.-এর তাফসির, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩১৬-১৩১৭]।

ধর্মগ্রন্থে ভাষা প্রসঙ্গের আয়াতসমূহ এবং এর তাফসির চমকপ্রদ। এতে ভাষা প্রশ্নে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহত্ত্ব ও বিজ্ঞান মনস্কতাকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। সমগ্র দুনিয়ায় একটিমাত্র ভাষা না হয়ে, জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার জন্মের রহস্যটিও মানবজাতির ইতিহাসের সঙ্গেই সংযুক্ত। ধর্মগ্রন্থই পৃথিবীর মধ্যে বিভিন্ন ভাষার বাস্তবতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে, যা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর হয়েছে।

লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা

ফয়সাল শাহ

মহান ভাষা আন্দোলন বাঙালির জীবনে সবচেয়ে তাৎপর্যময় ঘটনা। বাঙালির পরবর্তী ইতিহাস বিশেষ করে আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচক হিসেবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে আখ্যায়িত করা যায়। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাবার পর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি মাইলফলক। একুশের রক্তস্নাত অধ্যায়ের ফলেই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান –পিআইডি

১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয়ে ১৯৫৬ সালে শেষ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শেষ হলেও সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন এবং আমাদের জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের চেতনা আজো বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এ কাজটি বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সফলতার পর্বটি সম্পন্ন হবে বলে আমার বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন, 'ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা করে বিস্মিত হই ....ভাষা জিনিসটা আমরা অত্যন্ত সহজে ব্যবহার করি। কিন্তু তার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখা একটুও সহজ নয়।'

মানুষ মননশীল ও সামাজিক জীব। সে ভাবে, চিন্তা করে, স্বপ্ন দেখে ও কল্পনা করে। মানুষ তার ভাবনা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ভাষার মাধ্যমে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ ভাষা মানুষের ইচ্ছা–আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য কণ্ঠধ্বনির সাহায্য গ্রহণ করে। আবার কখনো কখনো হাত, পা, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ইঙ্গিত করে থাকে। কণ্ঠধ্বনির সাহায্যে মানুষ যত বেশি পরিমাণ মনোভাব প্রকাশ করতে পারে, ইঙ্গিতের সাহায্যে ততটা পারে না। কণ্ঠধ্বনির সাহায্যে মানুষ মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবও প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। কণ্ঠধ্বনি বলতে মুখগহ্বর, কণ্ঠ, নাসিকা ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত বোধগম্য ও অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টিকে বুঝায়। এ ধ্বনিই ভাষার অঙ্গ। কাজেই মনোভাব প্রকাশের জন্য মানুষের ফুসফুসতাড়িত বায়ু, গলানালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দাঁত, ঠোঁট, নাক প্রভৃতি বাকযন্ত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে আসার সময় যে আওয়াজ বা ধ্বনি সৃষ্টি হয় তার নাম ভাষা।

এই ধ্বনি বা আওয়াজটা হতে হবে অর্থবোধক, অর্থাৎ সব আওয়াজের একটা অর্থ বা মানে থাকতে হবে, না থাকলে আওয়াজ শুধুই আওয়াজ। মনের ভাব কী, মনের অবস্থাটা কেমন–এইসব অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য যে আওয়াজ উচ্চারিত হয় সেই আওয়াজগুলো অন্যেরাও যেন বুঝতে পারে। এটাই হলো অর্থবোধক শব্দ। সবার জানা ও সবাই যাতে বুঝতে পারে। এ রকম কতকগুলো অর্থবোধক শব্দ নিয়েই তৈরি হয় ভাষা। যা দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।

গ্রিকশব্দ 'Lagos' থেকে বর্তমান ইংরেজি শব্দ 'Language'-এর উৎপত্তি। 'Lagos' দ্বারা চিন্তাশক্তিকে বুঝায়। ভাষার সাহায্যে মানুষ তার চিন্তা, ধ্যানধারণা ও মনের ভাব প্রকাশ করে। আদিম যুগের মানুষ আকার-ইঙ্গিতে এবং অস্ফুট ধ্বনির সাহায্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান করত। পরবর্তীকালে ভাষা সেই স্থান দখল করে। মানুষের যোগাযোগের জন্য ভাষা খুবই প্রয়োজন। ভাষা না থাকলে আমরা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পিতামাতা কারো সাথে কথা বলতে পারতাম না। লেখাপড়ার বিষয়গুলো তো নানা ভাষায় লেখা হয়। ভাষা না থাকলে বই লেখা হতো না। আমরা পড়তে ও লিখতে পারতাম না। ভাষা আমাদের জীবন ও অস্তিত্বের সাথে জড়িত। ভাষা ছাড়া এ জীবন অর্থহীন।

আদিম যুগের মানুষ আকার ও ইঙ্গিতে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান করত। এভাবেই কালের বিবর্তনে ভাষার উৎপত্তি হয়। মানুষ যেদিন থেকে পৃথিবীতে আছে, ভাষাও সেই দিন থেকেই আছে। কিন্তু আদিমকালের ঐ শুরুর ভাষা সাজানো-গোছানো ছিল না। মানুষ এখনকার মতো ভাষা পেয়েছে আরো পরে। অভিব্যক্তির নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষ আজকের ভাষা পেয়েছে।

প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষার জন্ম নিয়ে চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'ভাষার জন্ম জীবের জন্মের ন্যায় নয়। অমুক সন তারিখে অমুক ভাষার জন্ম হইয়াছে; এইরূপ কথা বলিতে পারি না। ভাষা নদী প্রবাহের ন্যায়। বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম। যখন একটি ভাষা প্রবাহের মধ্যে কোনো সময়ের তাহার পরবর্তী ভাষাভাষীদিগের নিকট একটি নতুন ভাষা বলিয়া বোধ হয় তখন তাহার নতুন নামকরণ হইয়া থাকে।' তিনি আরো বলেছেন,

'ভাষা সম্ভবই হত না, যদি না মানুষের স্বভাবের মধ্যে ভাষার বীজ থাকত। মানুষের সৃষ্টির সঙ্গেই তাঁর মধ্যে এই ভাষার বীজ রেখে দিয়েছিলেন। এই হিসেবে ভাষাকে মানুষের প্রতি সৃষ্টিকর্তার দান বলা যেতে পারে। কিন্তু এই বীজ কী? সেটি হচ্ছে প্রত্যেক জিনিসের অনুভূতির সঙ্গে মানুষের গতি প্রবৃত্তি। একটা বাঘ বা সাপ দেখলে মানুষ পালাতে চায়; জল দেখলে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সেদিকে যেতে চায়, মানুষ শব্দ শুনলে শব্দের দিকে কান বাড়িয়ে দেয়। যখনই অনুভূতি স্মরণে আসে, তখনই পূর্বের গতি প্রবৃত্তিও জেগে ওঠে। যখন মানুষের গতি প্রবৃত্তি অঙ্গভঙ্গি থেকে বাগযন্ত্রের গতিতে পরিণত হলো, তখনই প্রথম ভাষার উৎপত্তি হলো। প্রথমে গতি, পরে অঙ্গভঙ্গি শেষে ভাষা। এই হলো ভাষার জন্মকথা।' ভাষাবিজ্ঞানী ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'ভাষা মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া, তাহা এতই স্বাভাবিক যে, চলাফেরা বা শ্বাসক্রিয়ার মতো স্বয়ংক্রিয় বৃত্তি বলিয়া মনে হয়– মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনির সমষ্টিই ভাষা।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন – পিআইডি

পৃথিবীতে অনেক ভাষা আছে। পৃথিবীর সব মানুষ একই বাক্-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ধ্বনি সৃষ্টি করে, তবুও এক এক গোষ্ঠীর ভাষা শৃঙ্খলা ও ভাষা বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম হয়। তাই একেক জাতি ও দেশের ভাষা একেক রকম হয়। আমাদের ভাষার নাম বাংলা ভাষা, আমাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা হলো সেই ভাষা যে ভাষা মানুষ জন্মের পর থেকেই শোনে, মায়ের কোল থেকে শেখে, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ থেকে আয়ত্তে আনে। অর্থাৎ মাতৃভাষা হচ্ছে মায়ের ভাষা। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, কারণ বাংলা ভাষাতেই আমাদের মা কথা বলেন। আমাদের জন্মের পর আমরা প্রথম মায়ের কাছ থেকে এই ভাষায় কথা বলে আসছি। পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষার একটি বিশিষ্ট স্থান ও মর্যাদা বিদ্যমান। বিশ্বের প্রায় ২০ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাংলা ভাষা পৃথিবীর বড়ো ভাষাগুলোর একটি। এই ভাষা সারাবিশ্বে সপ্তম বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে স্বীকৃত।

মাতৃভাষা বাংলার উপর বিভিন্ন সময় নেমে আসে দুর্যোগ। এ দেশের আপামর জনসাধারণ বাংলা ভাষায়ই কথা বলেছে। তারা বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে মেনে নেয়নি। বাংলা ভাষার জন্য বাঙালি মুসলমানদের গভীর মমত্ববোধ থাকলেও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একটি প্রশ্ন উঠেছিল 'বাংলা কি বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা?' বাঙালি মুসলমানদের উচ্চবিত্ত অংশটিই এই বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। তাদের মানসিকতা ছিল 'আশরাফ' অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণির মুসলমানদের ভাষা উর্দু আর 'আতরাফ' অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণির মুসলমানদের ভাষা বাংলা। এদের এই হাস্যকর, বিভ্রান্তিমূলক কল্পনা ও মনোভাবকে উদ্দেশ্য করে মওলানা আকরম খাঁ বলেছেন, 'পৃথিবীতে নানারকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে, ইহার মধ্যে বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু? এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত।'

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষারই বিজয় সূচিত হয়েছে। সকল বাক-বিতণ্ডার অবসান ঘটিয়ে বাংলা ভাষা মাতৃভাষা রূপে স্থান করে নিয়েছে। সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের বৈপ্লবিক আবির্ভাবের মধ্যদিয়ে এ ভাষা পেয়েছে নতুন গতি। এ ব্যাপারে ভাষা গবেষক ও ভাষাকর্মী মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, 'এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাদের মাতৃভাষা বাংলাতেই কথা বলে আসছে যুগযুগান্তর ধরে। যেহেতু জন্মের অব্যবহিত পরে এবং কালক্রমে তারা মায়ের মুখে এই ভাষা শুনেছে এবং পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ থেকে তা আহরণ করেছে, আয়ত্তে এনেছে, সে কারণে এক রূপ অবলীলায়ই তারা তাদের ভাষাকে মাতৃভাষারূপে কল্পনা করার অবকাশ যেমন তাদের ঘটেনি, তেমনি বাংলা ভাষা তাদের মাতৃভাষা কি-না এই প্রশ্নও মনে জাগেনি। কেননা মাতৃভাষা মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গী এবং অদ্বিতীয় সত্তার মতো। ... কিন্তু তা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত মানুষের মনে বিভিন্ন যুগে এ সংক্রান্ত প্রশ্ন জেগেছে এবং নানা দ্বন্দ্ব-সংশয় জন্ম নিয়েছে। ... বাংলা ভাষা বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা কি না এই প্রশ্ন এবং এ নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংশয়, বাক-বিতণ্ডা আধুনিক কালেই সবচেয়ে বেশি ব্যপ্তি লাভ করেছে'।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী বলেন, 'বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা। ইহা দিনের আলোর মতো সত্য। ভারতব্যাপী জাতীয়তা সৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অনভিপ্রেত হউক না কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাধিবার ন্যায় নিষ্ফল। বাংলা ভাষায় জ্ঞানহীন মৌলভী সাহেবগণের বিদ্যা ও বঙ্গদেশে উর্দু পত্রিকার বিফলতা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সুতরাং জনসমাজকে উর্দু শিক্ষা হইতে নিষ্কৃতি দিলে নিশ্চয়ই জাতীয়তা বৃদ্ধির অনিষ্ট হইবে না।' সাহিত্যিক সৈয়দ এমদাদ আলী বলেন, 'কেহ উর্দুর স্বপ্নে বিভোর হইলেও মুসলমানের মাতৃভাষা যে বাংলা এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈত থাকা উচিত নহে।' হাবীবুল্লাহ বাহার বলেন, 'বহু ভাষা আজ বিশ্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং বঙ্গভাষাই বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের মাতৃভাষা।' সাহিত্যিক, সাংবাদিক ছাড়া রাজনীতিবিদগণও এ ব্যাপারে কলম ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে রাজনীতিক কমরেড মোজাফফর আহমদ বলেছেন, 'যখন উর্দু ভাষা জন্মগ্রহণ পর্যন্ত করে নাই, তখনো বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা ছিল।'

মাতৃভাষা প্রতিটি মানুষের কাছে খুবই প্রিয়। মাতৃভাষার বন্ধন

কোনোদিন ছিন্ন করা যায় না। শিক্ষাদীক্ষা ও প্রতিভা বিকাশের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হলো মাতৃভাষা। নিজের জন্মভূমি কিংবা মাতৃভূমি ত্যাগ করা সম্ভব হলেও মানুষের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই মাতৃভাষা অর্থাৎ তাঁর নিজের মায়ের বুলি ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। আমরা আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য অবশ্যই অন্যান্য ভাষা শিখব কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে নয়। শেকড় ছাড়া যেমন বৃক্ষ বাঁচতে পারে না, তেমনি নিজের মাতৃভাষার চর্চা ও ব্যবহার ছাড়া জাতি বাঁচতে পারে না। বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতি হলো আমাদের শেকড়। আমাদের অস্তিত্ব। পৃথিবীর বহু লেখক, দার্শনিক, মনীষী যারা বিদেশি ভাষার সহায়তায় সাফল্য অর্জন করেছেন তাদের সৃষ্টির পেছনে এবং তাদের ধ্যানধারণায়, স্বপ্ন-কল্পনায় একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা।

বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতিক চর্চা করে আমরা যতই দক্ষতা লাভ করি না কেন আসলে প্রত্যেক মানুষকে প্রথমে মাতৃভাষারই সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। মাতৃভাষায় চিন্তা করেই প্রত্যেক মানুষকে বিদেশি ভাষায় তাঁর অনুবাদ কিংবা রূপান্তর সাধন করতে হয়। মাতৃভাষার অবলম্বন ছাড়া এই রূপান্তর সাধন সম্ভব নয়। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। আমাদের হৃদয়ের গভীরে এর স্থান। বাংলা ভাষা আমাদের প্রথম ঠিকানা, আমাদের শেকড়, আমাদের জীবন। আমাদের কাছে এই ভাষা মাতৃস্তন্যস্বরূপ। এই ভাষার রস পান করেই আমরা প্রাণবান মানুষ হয়ে বেড়ে উঠছি। অতএব মাতৃভাষা চর্চা ব্যতীত আমাদের উন্নতি ও বিকাশ সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রভাষা হলো রাষ্ট্রের ভাষা, রাষ্ট্র প্রবর্তিত ভাষা। একটি দেশের রাষ্ট্রভাষা সে দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, গণতন্ত্র, রাজনীতি, জাতীয়তা, স্বতন্ত্রবোধসহ সকল পরিচয় ফুটে ওঠে। এই ভাষার মাধ্যমে অফিস–আদালতের কাজ চলবে, শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শনসহ সকল বিষয়ে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকবে। যে কোনো দেশের রাষ্ট্রভাষা সে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং অস্তিত্বের প্রহরী হিসেবে কাজ করে। মাতৃভাষা যেমন জাতির অতুলনীয় সম্পদ তেমনি রাষ্ট্রভাষাও জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কাজেই কোনো দেশের মাতৃভাষার দাবিই সে দেশের রাষ্ট্রভাষা হওয়াটা অধিক যুক্তিসংগত এবং বাস্তব সত্য। বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করতে যেমন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে তেমনিভাবে একটি রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে অর্জিত হয়েছে মাতৃ ভাষা থেকে রাষ্ট্রভাষার অধিকার। মাতৃভাষার ভালোবাসায় সিক্ত হয়েই এ দেশের মানুষ রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

রাষ্ট্রভাষার বিতর্কটি ব্যাপকতা পায় ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর থেকে। কিন্তু এই বিতর্কের শুরু আরো অনেক পূর্ব থেকেই। বাংলা ভাষাভাষীদের মাতৃভাষা যাতে রাষ্ট্রভাষার আসনে সমাসীন হতে না পারে সেজন্য ষড়যন্ত্র চলেছে দীর্ঘ দিনব্যাপী। বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ-ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকলে নতুন করে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নিয়ে আলাপ–আলোচনা শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে যাই হোক বাংলাদেশে বাংলাই হবে সরকারি ভাষা।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপারে লাহোর প্রস্তাবের ভূমিকা অনবদ্য। ভাষা সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর এই প্রসঙ্গে বলেন, 'বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বিষয়ক এই স্বপ্ন পূরণের মহা সুযোগ এনে দেয় ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত ভূভাগ এবং হিন্দু অধ্যুষিত অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে তা শুধু উপমহাদেশের স্বাধীনতার বাস্তব পথই উন্মুক্ত করে দেয় না, বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অপূর্ব সুযোগও সৃষ্টি করে দেয়।' বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা যেমনভাবে উচ্চারিত হচ্ছিল ঠিক তেমনি বাংলাকে বাদ দিয়ে হিন্দি ও উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্তও চলছিল সমভাবে। এদেশের শিক্ষিত শ্রেণিই সেই বিতর্ক ও চক্রান্তের জন্ম দেয়।

পণ্ডিত সমাজ ও মনীষীরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে এ ব্যাপারে প্রবাসী পত্রিকায় 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বিদগ্ধজনের আলোচনা'– এই শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অতুল চন্দ্র গুপ্ত, অর্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, খনেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রফুল্ল কুমার সরকার, দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ। এই সভায় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কতগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে তৃতীয় প্রস্তাবটি ছিল: '.... বর্তমানে যদি রাষ্ট্রভাষা নির্দিষ্ট করতেই হয়, তবে বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ ও সমৃদ্ধি এবং ঐ ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা দ্বারা প্রভাবান্বিত মনে রাখিয়া বঙ্গভাষাকেই রাষ্টীয় ভাষারূপে নির্ধারণ করা উচিত।' মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর মতে, 'স্বাধীনতা লাভের পূর্বে অবিভক্ত ভারতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি-না এ বিষয়ে সম্ভবত এটিই

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৭-এর উদ্‌বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন –পিআইডি

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা – পিআইডি

বিদগ্ধজনের প্রথম আলোচনা ও উদ্যোগ।' মাতৃভাষা বাংলার গুরুত্ব এবং মাতৃভাষার স্থলে অন্য কোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়েরও অধিক সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠাসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয় তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি?' শত বাধা সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমান এবং অবিভক্ত ভারতের বাঙালি হিন্দুগণ বাংলাকে মাতৃভাষা থেকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ একদিনে হয় না। নদী যেমন বাঁকে বাঁক মোড় নিয়ে এঁকেবেঁকে পাহাড়, প্রান্তর, বনাঞ্চল পেরিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়, বাংলা ভাষাও তেমন চলমান নদী প্রবাহের মতোই ইতিহাসের নানা চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে।

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ

বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে এসেছে তা নিয়েও মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এক সময় একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। কথাটি বলার কারণ হলো, বাংলা ভাষায় আমরা যেসব শব্দ ব্যবহার করি তাঁর অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত ভাষার। কিন্তু পরবর্তীতে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ তথ্য সঠিক নয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ ব্যাপারে একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন– 'বাংলা ভাষা সংস্কৃতির দুহিতা নয় তবে দূর সম্পর্কের আত্মীয়।' বাংলা ভাষার সূচনা করেন বৌদ্ধগণ। বাংলাদেশে বৌদ্ধশাসনের অনুকূল পরিবেশেই বাংলা ভাষার গোড়াপত্তন হয়। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ড. সুনীতি কুমার চট্টোপধ্যায়, ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ বাংলা ভাষার প্রধান প্রধান ভাষা পণ্ডিতগণ এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 'সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, 'বাংলাদেশের পাল রাজাদের আমলে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। বৌদ্ধগণ ও দোহাগুলো সেকালের বাংলা ভাষার নিদর্শন।' সুকুমার সেন বলেছেন, 'বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক দশম হইতে মধ্য চতুর্দশ শতাব্দ। আদিস্তরের অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার প্রধান নিদর্শন হইতেছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরান বাঙালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' নামক বইটির প্রথম গ্রন্থ 'চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চিয়' অংশে সংকলিত চর্যাপদগুলি।'

ভাষা পণ্ডিতদের মতে, প্রাকৃত জনসাধারণের আদিম প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা, প্রাকৃতজনের ভাষা। বাংলা ভাষার আদি জননী হলো প্রাকৃত ভাষা। এই প্রাকৃত বা প্রাকৃতজনের ভাষা ছিল অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। পূর্বাঞ্চলের ভাষা পূর্বী প্রাকৃত থেকে গৌড়ীয় প্রাকৃত ও তারপর নানা ভাষার সংস্পর্শে এসে ও শব্দ আহরণ করে বর্তমান কালের বাংলায় পরিণত হয়েছে। সংস্কৃতজ্ঞ অভিজাত শ্রেণির চোখে যারা ছিল নীচ শ্রেণির সাধারণ লোক তাদেরই ওরা নাম দিয়েছিলেন 'প্রাকৃতজন'। প্রাকৃত কথাটির অর্থ হলো স্বাভাবিক বা প্রকৃতি থেকে আগত। অর্থাৎ জনসাধারণের ভাষা। এই প্রাকৃত ভাষাটি কালক্রমে আরো 'প্রাকৃত' হয়ে গিয়েছিল সাধারণ লোকের মুখে মুখে বিবর্তন লাভ করে। তার সেই পরবর্তী রূপের বেশ মানানসই এক নাম 'অপভ্রংশ'। এই অপভ্রংশের পূর্বী অর্থাৎ মাগধী রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। বাংলা ভাষার উৎপত্তি প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'বাঙালা ও তাহার সহোদরা হিন্দী প্রভৃতি ভাষা প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্য ভাষা হইতে উৎপন্ন সত্য। কিন্তু তাহার কথ্য রূপই ইহাদের মূল। ইহাদিগকে আমরা আদিম প্রাকৃত বলতে পারি ... আদিম প্রাকৃত হইতে তিনটি স্তরের মধ্যদিয়া আমাদের বাঙালি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম স্তর পালির, দ্বিতীয় স্তর নাটকীয় প্রাকৃতের এবং তৃতীয় স্তর অপভ্রংশের সমশ্রেণীস্থ।' কাজেই ভাষাবিদদের সংজ্ঞার আলোকে এ কথা সুস্পষ্টভাবেই বলা যায়– আদিম প্রাকৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম।

বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ লাভ করে বৌদ্ধযুগে পালবংশের রাজত্বকালে। ৭৫০-১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ শাসকগণের রাজত্বকালে বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটতে থাকে। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হলো *চর্যাপদ*। ১৯০৭ সালে পন্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের মিউজিয়াম থেকে *চর্যাপদ* উদ্ধার করেন। *চর্যাপদ* রচনা

করেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মযাজকগণ। এগুলো বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যে আদিমরূপের অতি মূল্যবান নিদর্শন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে আছে। *চর্যাপদ* আবিষ্কৃত হবার পর আমরা হাজার বছর আগের বাংলা ও বাঙালির কথা জানতে পারি। বাংলা ভাষা বিকাশে বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক যেমন– মহাকবি আলাওল, সৈয়দ সুলতান, শাহ গরীবুল্লাহ, নিধুগুপ্ত, রামমোহন রায়, আব্দুল হাকিম, দৌলত উজীর, শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ হামজা, শেখ সাদী, লালন শাহ প্রমূখের অবদানের কথাও স্মরণীয়। আধুনিক বাংলা ভাষার স্থপতিদের মধ্যে প্রধান প্রধান কবি সাহিত্যিক হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জসিম উদদীন প্রমুখ। তাঁরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধির স্বর্ণ শিখরে নিয়ে যান। আজকের অতি আধুনিক কবি, সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষার যে প্রাণময়, দীপ্তিময় ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত ধারা সৃষ্টি করেছে, তাতে বাংলা ভাষা বিশ্ব ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলা ভাষা শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশেরই নয়, সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত হয়েছে। আমাদের ভাষা ও সাহিত্য এখন একটি স্বাধীন জাতির মানসিক ও সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা মূর্ত করে এগিয়ে যাচ্ছে নব নব সৃষ্টির সন্ধানে।

দেশ বিভাগের পর বাংলা ভাষার চরম বিপর্যয়ের মুখে এ দেশের বাংলা ভাষাপ্রেমী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় অধ্যায় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদদের রক্তস্নাত আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাংলা ভাষার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই ঐতিহাসিক সত্যকে উপলব্ধি করে যথার্থই বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে উচ্চ স্থানের অধিকারী করিয়াছে। পাক-ভরত উপমহাদেশের দুইটি বিশিষ্ট প্রদেশের হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রতিভা ইহাকে একটি বিশ্ব ভাষায় (world language) পরিণত করিবে।' ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র এই মর্মবাণী আজ বাস্তব সত্য। বাংলা ভাষা বিকশিত হয়ে আজ বিশ্ব ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে।

ভাষা আন্দোলন মানে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের রয়েছে এক গভীর ও চিরন্তন সম্পর্ক। বাংলা ভাষাকে পূর্ণতম রাষ্ট্রীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল সম্পূর্ণরূপে বাংলা ভাষাভাষীদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। সে রকম একটি রাষ্ট্র হলো বাংলাদেশ– বাংলা ভাষার ওপর ভিত্তি করে যার জন্ম। ১৯৫২ সালে একটি রক্তস্নাত আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর ১৭ দিনের মাথায় তমুদ্দুন মজলিস নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১। এই চব্বিশ বছরে ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের পথ বেয়ে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও পূর্বপ্রস্তুতি। এ যুদ্ধের অর্জন, প্রাপ্তি ও বিজয় আমাদের সাহস যুগিয়েছে সামনে এগুবার। একুশের চেতনা আমাদের প্রাণে যে বিদ্রোহের দাবানল ও অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছে তার আলোকবর্তিকা হলো '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা পিপাসু বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল ভাষা আন্দোলন। অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির প্রথম পর্যায়ের মুক্তিযুদ্ধ।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মৃত্তিকার ওপর স্বাধীন–সার্বভৌম বাংলা ভাষাভাষী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এক অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক ঘটনা। পৃথিবীর রাষ্ট্র গঠনের নানা উপাচারের এটি এক নতুন মাত্রা এবং বিরল দৃষ্টান্ত। বাঙালি জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য জাতি হিসেবে এই বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভাষা আন্দোলনেরই সুদূরপ্রসারী প্রতিশ্রুতি। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন বছরের পর বছর ধরে পাকিস্তানি চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বাঙালিদের উদ্বুদ্ধ করেছে। আর তারই পরিণতিতে সূচনা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। স্বাধীনতা একটি দেশের অমূল্য সম্পদ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংগ্রাম ও রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করি আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। বিশ্বসভায় একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে এই স্বাধীনতার মাধ্যমে। বাংলাদেশ নামক স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে এসব ঘটনাবলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে সত্য, তবে যে ঘটনাটি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে সেটা হলো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। ভাষা–আন্দোলনের ঐতিহাসিক পথ বেয়েই একদিন বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভাব ঘটে স্বাধীন–সার্বভৌম বাংলাদেশের।

মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছিল বিজাতীয় প্রভুত্ব ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম প্রতিরোধ– জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ। আর সেই চেতনা জাতিকে দিয়েছে আত্মপরিচয়, উদ্বুদ্ধ করেছে অন্যায়, নিপীড়ন ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের সর্বস্ব পণ করতে। রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার জন্য আন্দোলন ও তার পরবর্তী স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের পরিণতি হচ্ছে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এর পরবর্তী অধ্যায় হলো বাঙালি সংস্কৃতি উন্মেষের আন্দোলন। এরপর হচ্ছে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের আন্দোলন এবং একাত্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ–সবই একই সূত্রে গাঁথা। ভাষা সংগ্রামের প্রথম পথযাত্রা শুরু করে জাতীয় চেতনার যে বৈপ্লবিক মাটি তারা আমাদের জন্য উর্বর করে তুলেছেন, সেই মাটিতে ক্রমাগত রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বীজ বুনেছি আমরা, চয়ন করেছি স্বাধীনতার ফসল। বাহান্নর একুশের ভাষা আন্দোলন থেকে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিণতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম জাতিরাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক

নিবন্ধ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)

সম্পাদনা বিভাগ

জাতিসংঘের উদ্যোগে সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সর্বজনীনভাবে একগুচ্ছ সমন্বিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এতে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র মেয়াদ শেষে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) গৃহীত হয়। এসডিজির সংশ্লিষ্টতা ও ব্যাপকতা এমডিজির চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এসডিজির সফল বাস্তবায়নের মধ্যে। এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে সকল ঘাটতি রয়েছে তা এসডিজির মাধ্যমে পূর্ণ হবে এবং মানব কল্যাণে আরো কিছু নতুন মাত্রা যোগ হবে। এসডিজির সফলতার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসমূহ মোকাবিলা করে একটি টেকসই ও নিরাপদ বিশ্ব আগামী ১৫ বছরের মধ্যে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

এসডিজির এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। মোট ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১১টি অভীষ্টের ধারণা বাংলাদেশই দিয়েছে। এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যও সারাবিশ্বে প্রশংসিত। বিগত বছরগুলোতে, এমনকি সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও, বাংলাদেশের ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৭.১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই হার ৭.৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। দারিদ্র্য হার নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকের ৫৬.৭ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে, প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রভর্তির হার শতভাগে উন্নীত হয়েছে; শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৪৬ থেকে ৪৬-এ নেমে এসেছে; মাতৃমৃত্যু হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এমডিজিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ছয়-ছয়টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। এত বেশি সংখ্যক পুরস্কার আর কোনো দেশ অর্জন করতে পারেনি। বাংলাদেশের এই অনন্য অর্জনের জন্য জাতিসংঘ বাংলাদেশকে এমডিজির রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এসডিজির ১৬৯টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সকল দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। যেমন বাংলাদেশের জন্য ১৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা প্রযোজ্য। সারাবিশ্বে এসডিজি নিয়ে সাড়া পড়ে গেলেও দেখা গেছে যে, অঙ্গীকারবদ্ধ অনেক দেশ তাদের বার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজিকে সঠিকভাবে সম্পৃক্ত করতে পারেনি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ও বর্তমান ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক বাজেটে এসডিজিকে বিশেষ গুরুত্বসহ স্থান দিয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য ১৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্ণাঙ্গ কর্মকৌশল প্রণয়ন করে তা অনুসরণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সরকারের প্রায় প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান কোনো না কোনোভাবে এসডিজির বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে দায়বদ্ধ। তাছাড়া সকল মানুষের কল্যাণে নিবেদিত এসডিজিকে সফল করে তোলার জন্য সরকার, উন্নয়ন সংস্থা, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তার সমন্বয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এসডিজি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ প্রাথমিক ধারণা দেওয়া জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশ আয়োজিত MDG's to SDG's-a way forward শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন – পিআইডি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) সমূহ এবং এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার গৃহীত পরিকল্পনাসহ মন্ত্রণালয় ভিত্তিক দায়িত্ব বিভাজন নিম্নে তুলে ধরা হলো :

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সমূহ

১. দারিদ্র্য বিলোপ: সরকারের দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রমকে টেকসইভাবে বাস্তবায়নের দ্বারা দরিদ্র ব্যক্তি বা পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তোলার মাধ্যমে চরম দারিদ্র্য মোকাবিলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করে তোলা।

২. ক্ষুধামুক্তি: পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে ক্ষুধা, অপুষ্টি দূর ও স্থানীয় খাদ্য মজুদের ভারসাম্য সৃষ্টি করা। একই সাথে, সেচ ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক জলাধারের ধারণক্ষমতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম অবকাঠামোর ব্যবহার কমিয়ে একটি প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক টেকসই কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ২০ অক্টোবর ২০১৫ শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি'র (একনেক) সভায় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন প্রদান করা হয় – পিআইডি

৩. সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ: সুস্থ ও সচেতন জীবনযাপন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে দক্ষতার সাথে পরিচালিত করা। মাতৃ ও শিশুমৃত্যু, মহামারি ও প্রাণঘাতী রোগসমূহ মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৪. মানসম্মত শিক্ষা: শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সকল প্রকার মানুষের জন্য টেকসই, কল্যাণকর জীবন ও জীবিকার সুযোগ এবং সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। তৃণমূল পর্যায়ে পেশাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৫. নারী-পুরুষের সমতা: নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন তথা সক্ষমতা নিশ্চিত করা।

৬. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন: পরিকল্পিত পানির উৎস সংরক্ষণ উদ্যোগ ও দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাজের সকলের জন্য, বিশেষ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুপেয় পানি ও পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৭. সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি: বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের সকলকে আধুনিক, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া। জ্বালানি বা বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সর্বনিম্ন রাখা।

৮. যথোচিত কর্ম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির জন্য যোগ্যতা অনুসারে টেকসই ও মানসম্মত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। ব্যক্তির ও সামাজের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাগরিকদের পরিবেশ ও সমাজবান্ধব জীবিকা গ্রহণে উৎসাহিত করা।

৯. শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো: মানব বসতি, কৃষিজমি, বন, পাহাড় ও জলাশয়সহ সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত রেখে বাড়িঘর নির্মাণ ও শিল্প অবকাঠামো স্থাপনে অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক টেকসই প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহার করা।

১০. অসমতা হ্রাস: অপেক্ষাকৃত বেশি দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলসমূহে উন্নয়ন ও কাজের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় ও জীবনমানের অসাম্য দূর করা।

১১. টেকসই নগর ও সমাজ: পরিকল্পিত বসতি স্থাপন, টেকসই ও পরিবেশসম্মত উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে মানব বসতিসমূহকে নিরাপদ, প্রতিকূলতা সহনীয় এবং টেকসই করে তোলা।

১২. দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন: প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভোগ্যপণ্যের স্বাভাবিক উৎপাদন ও ব্যবহার টেকসই করার লক্ষ্যে এ সকল সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত সঠিক তথ্যাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১৩. জলবায়ু কার্যক্রম: জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি, নেতিবাচক প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে স্থানীয় পর্যায়ে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এসকল ঝুঁকি প্রশমন করে স্থানীয় রীতি ও মূল্যবোধসম্পন্ন টেকসই জীবনাচার পালনে সমাজের সকলকে ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৪. জলজ জীবন: ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা ও ব্যবহার বিবেচনা করে মৎস্য ও উদ্ভিজ্জ সম্পদসহ সকল প্রকার জলজ প্রাণী এবং সম্পদের নিয়ন্ত্রিত ও টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে এসব সম্পদ ও প্রাকৃতিক উপাদানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা।

১৫. স্থলজ জীবন: প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, স্থানীয় বায়ুমণ্ডল, জলাধার, বনাঞ্চল, পাহাড় ইত্যাদির স্বাভাবিকতা, বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, পুনরুদ্ধার, পুনঃসৃজন এবং এসব সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১৬. শান্তি ও ন্যায়বিচার কার্যকর প্রতিষ্ঠান: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কাজের মাধ্যমে এমন সমাজব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা যেখানে ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার, সমঅধিকার, জাবাবদিহি, বহুমতের প্রতি শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সরল জীবনযাপনের সামাজিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

১৭. লক্ষ্য পূরণে অংশীদারিত্ব: সামাজিক কার্যক্রমে সমাজের সকল পর্যায় ও আন্তঃআঞ্চলিক অংশীদারিত্ব ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, অংশীদারিত্ব, আন্তঃআঞ্চলিক (এলাকা) সম্পর্ক উন্নয়ন করা। যার ফলে সমগ্র অঞ্চলে উন্নয়ন টেকসই হয়।

এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬ - ২০২০) গৃহীত অভীষ্টসমূহ

	এসডিজিসমূহ	৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত অভীষ্টসমূহ
	এসডিজি-১ **দারিদ্র্য বিলোপ**	• মাথাপিছু দারিদ্র্যের হার ২৪.৮ শতাংশ থেকে ৬.২ শতাংশ কমিয়ে ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনা • অতি দারিদ্র্যের হার ব্যাপকভাবে হ্রাস করা (২০২০ সালে ৮%-এ নামিয়ে আনা)।
	এসডিজি-২ **ক্ষুধামুক্তি**	• অনূধর্ষ্ক ৫ বছর বয়সি শিশুদের বিকাশের বাধাসমূহ ৩৬.১ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনা • অনূধর্ষ্ক ৫ বছর বয়সি শিশুদের কম ওজনের মাত্রা ৩২.৬ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা।
	এসডিজি-৩ **সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ**	• অনূধর্ষ্ক ৫ বছর বয়সি শিশুমৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৪১ থেকে ৩৭-এ নামিয়ে আনা • প্রসবকালীন ও প্রসূতিমৃত্যু হার প্রতি লাখে ১৯৪ থেকে ১০৫-এ নামিয়ে আনা • অনূধর্ষ্ক ১২ বছর বয়সি শিশুদের হামের টিকা প্রদানের হার ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণ • নবজাতক জন্মের ক্ষেত্রে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর দ্বারা পরিচর্যার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীতকরণ • ফার্টিলিটি রেইট ২-এ নামিয়ে আনা • জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর ব্যবহার ৭৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।
	এসডিজি-৪ **মানসম্মত শিক্ষা**	• প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রভর্তির হার ১০০% নিশ্চিতকরণ • প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ • শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী হার বর্তমানে ৮০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণ।
	এসডিজি-৫ **নারী-পুরুষের সমতা**	• ২০-২৪ বছর বয়সি নারী শিক্ষার্থী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর হারে সমতা আনয়ন। সরকারি চাকরিতে ৯ম ও তদূধর্ষ্ক গ্রেডে নারী কর্মকর্তার অন্তর্ভুক্তি ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ
	এসডিজি-৬ **নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন**	• গ্রাম ও শহর এলাকার সব মানুষের জন্য নিরাপদ খাবার পানির নিশ্চয়তা বিধান করা • শহুরে মানুষের জন্য ১০০% স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার নিশ্চিত করা • গ্রামের মানুষের জন্য ৯০% স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার নিশ্চিত করা।
	এসডিজি-৭ **সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি**	• বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৩ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ • ৯৬% মানুষের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণ • জ্বালানি দক্ষতা ১০ শতাংশে উন্নীতকরণ।
	এসডিজি-৮ **যথোচিত কর্ম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি**	• লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নির্বাচিত সময় পর্যন্ত বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৭.৪% অর্জন • ২০২০ সাল নাগাদ সর্বমোট রাজস্ব জিডিপির ১০.৭% থেকে ১৬.১%-এ উন্নীতকরণ • বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫% ধরে রাখা • সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বাড়ানো (বর্তমানের ১.৫৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ৯.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ। • ২০২০ সাল নাগাদ রপ্তানি ৫৪.১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ (বর্তমানে ৩০.৩ বিলিয়ন ডলার) • ট্রেড-জিডিপি হার ২০২০ সালে ৫০%-এ উন্নীতকরণ • ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান বর্তমানের ১৫% থেকে ২০%-এ উন্নীতকরণের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
	এসডিজি-৯ **শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো**	• মাওয়া-জাজিরায় ৬.১৫ কি.মি. দীর্ঘ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ করা • ২৬ কি.মি. দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা • ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করে সকল শহরের যানজট ব্যাপকভাবে কমানো • গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় বর্তমানে জিডিপির ০.৬% থেকে ১% এ উন্নীতকরণ • সরকারি প্রাইমারি স্কুলে কম্পিউটার ল্যাবের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করা • টেলিফোন গ্রাহক সংখ্যা ১০০%-এ উন্নীত করা • ইন্টারনেটের ব্রডব্যান্ড কভারেজ বর্তমানে ৩০% থেকে ৩৫% উন্নীতকরণ • তথ্যপ্রযুক্তি, ভ্রমণ ও পর্যটন খাত থেকে আয় ১.৫০ বিলিয়ন ডলার থেকে ২.৬ বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি করা।
	এসডিজি-১০ **অসমতা হ্রাস**	• সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বৃদ্ধিকরণ (ব্যয় জিডিজির ২.৩%-এ উন্নীতকরণ) • আয়-বৈষম্য কমানো (০.৪৫৮ থেকে পর্যায়ক্রমে নিচে নামিয়ে আনা)।
	এসডিজি-১১ **টেকসই নগর ও সমাজ**	• শহরে বসবাসরত মানুষের জন্য উন্নতমানের পানির উৎস নিশ্চিত করা • নিষ্কাশন পদ্ধতি ৮০%-এ সম্প্রসারণ করা • বর্ধিত হারে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সহায়ক টেকসই নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
	এসডিজি-১২ **দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন**	• ৭০% গাছের ঘনত্বসহ উৎপাদনশীল বনাঞ্চলের পরিমাণ ২০%-এ উন্নীতকরণ।
	এসডিজি-১৩ **জলবায়ু কার্যক্রম**	• বড়ো বড়ো শহর এবং ঢাকার বাতাসের মান উন্নয়ন • কলকারখানার বর্জ্য নির্গমন শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা।
	এসডিজি-১৪ **জলজ জীবন**	• জলজ প্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে শুষ্ক মৌসুমে ১৫% জলাভূমি নিশ্চিতকরণ • সমুদ্র উপকূল রক্ষার স্বার্থে এর তীরে ৫০০ মিটার প্রস্থের সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা।
	এসডিজি-১৫ **স্থলজ জীবন**	• পানি এবং স্থলভূমির টেকসই ব্যবহারের জন্য ল্যান্ড জোনিং সম্পন্নকরণ • পরিবেশ উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলাকরণ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়সমূহকে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ডিজাইন প্রণয়ন এবং বাজেট বরাদ্দের সাথে সমন্বয়করণ।
	এসডিজি-১৬ **শান্তি ও ন্যায়বিচার কার্যকর প্রতিষ্ঠান**	• সকল মানুষের জন্য আইনের শাসন নিশ্চিত করা • ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ৩৭ হাজার ভুক্তভোগীকে আইনগত সহায়তা প্রদান • সত্য ও ন্যায়-নিষ্ঠার সম্প্রসারণ ঘটানো এবং দুর্নীতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ • সংসদীয় পদ্ধতি কার্যকর ও শক্তিশালীকরণ।
	এসডিজি-১৭ **লক্ষ্য পূরণে অংশীদারিত্ব**	• বৈদেশিক সহায়তার ক্ষেত্রে কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ • উন্নয়ন সহযোগীদের নীতি ও নিয়মকানুনের সাথে সংগতি বিধান এবং তাদের সিস্টেমের সাথে যথাযথভাবে মানিয়ে নেওয়া • বাংলাদেশের উন্নয়নে কার্যকর সহযোগিতা পেতে উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন।

এসডিজি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ ৪৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এসডিজির টার্গেটসমূহ বাস্তবায়নে সরাসরি সম্পৃক্ত।

৬টি সাংবিধানিক এবং বিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা যথা– দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, তথ্য কমিশন এবং জাতীয় সংসদ কর্মপরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগসহ (জিইডি) পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগ সেক্টরাল কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে এসডিজি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত।

জিইডি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ টার্গেট অর্জনের কর্মপরিকল্পনায় সম্ভাব্য নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১১টি মন্ত্রণালয়কে গুরুত্ব দিয়ে এবং অন্তর্ভুক্ত করে 'এসডিজি মনিটরিং এবং মূল্যায়ন কমিটি' নামে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব কমিটি আহ্বান করবেন এবং জিইডি এই কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

এমডিজি মনিটরিং ও রিপোর্টিংয়ের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এবং বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য দূরীকরণের ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্বপালনকারী জিইডি সরকারের এসডিজি'র ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে।

এসডিজি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন শেষে একটি মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রস্তুত করা হবে।

এসডিজি অর্জনে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক টার্গেটসমূহ

১.১ ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা, যাদের মাথাপিছু উপার্জন দৈনিক ১.২৫ ডলারের নিচে।

মূল দায়িত্বঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সহ মূল দায়িত্বঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শিল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া; মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১.২ জাতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী দারিদ্র্যসীমার মধ্যে থাকা নারী-পুরুষ-শিশুদের সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

মূল দায়িত্বঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল)

সহ মূল দায়িত্বঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জাতীয় দারিদ্র্য দূরীকরণ ফোকাল পয়েন্ট)

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শিল্প, ধর্ম, শ্রম ও কর্মসংস্থান, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া; মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১.৩ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, পদক্ষেপ ও ভিত্তি বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অসহায়দের একটি বলিষ্ঠ পরিধির আওতায় নিয়ে আসা।

মূল দায়িত্বঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল)

সহ মূল দায়িত্বঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জাতীয় দারিদ্র্য দূরীকরণ ফোকাল পয়েন্ট)

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, যুব ও ক্রীড়া, সংস্কৃতি বিষয়ক, শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১.৪ অর্থনৈতিক উৎসসহ মৌলিক সেবা, ভূমির মালিকানা এবং সম্পত্তিসহ উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, নব্য-প্রযুক্তি ও আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে, ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং এ ক্ষেত্রে দরিদ্র ও অসহায়দের অগ্রাধিকার দেওয়া;

মূল দায়িত্বঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সহ মূল দায়িত্বঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি, পরিবেশ ও বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি, পানিসম্পদ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, যুব ও ক্রীড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, শিল্প; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অসহায়দের দুর্যোগ সহনীয় করে তোলা এবং তাদের ওপর থেকে প্রাকৃতিক কিংবা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দুর্যোগ ও আঘাতের প্রভাব কমানো।

মূল দায়িত্বঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্বঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি, স্বরাষ্ট্র, তথ্য, শিক্ষা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সমাজকল্যাণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পানি সম্পদ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক; বাংলাদেশ ব্যাংক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১.এ বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা। বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পর্যাপ্ত এবং সম্ভাব্য উন্নতির জন্য উন্নয়নমূলক সহযোগিতা বাড়ানো। সর্বক্ষেত্রে দূরীকরণ কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রণয়ন করা।

মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১.বি দারিদ্র্যবান্ধব এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল উন্নয়ন কৌশল বিবেচনায় রেখে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি শক্তিশালী নীতিমালা অবকাঠামো তৈরি করা। দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচিতে আরো বেশি বিনিয়োগ করা।

মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র, পরিবেশ ও বন; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ

২.১ ক্ষুধা দূর করা এবং সকল মানুষের জন্য বিশেষ করে দরিদ্র ও ক্ষুধার ঝুঁকিতে থাকা মানুষ এবং শিশুদের জন্য সারা বছর নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়

সহ. মূল দায়িত্ব: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিল্প, মহিলা ও শিশু বিষয়ক , তথ্য, শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

২.২ ২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সের শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের অন্তরায় দূর করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের, গর্ভবতী মায়েদের, দুগ্ধদানকারী মায়েদের এবং সকল বয়স্ক মানুষের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে সঠিকভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল প্রকার অপুষ্টি দূর করা।

মূল দায়িত্ব: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: অর্থ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শিল্প, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, তথ্য, শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

২.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে স্বল্প পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারীদের কৃষিজ উৎপাদন ও আয় দ্বিগুণ করা। বিশেষ করে নারী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশু ও মৎস্য চাষিদের ক্ষেত্রে। ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা ও বাজার সুবিধায় সমান অধিকার নিশ্চিত করা। মূল্য সংযোজন ও অকৃষি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, অর্থ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিল্প (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন), ভূমি, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পরিবেশ ও বন; বন বিভাগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, স্থানীয় সরকার বিভাগ

২.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই খাদ্য উৎপাদনের ধারা নিশ্চিত করা এবং উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সহনীয় কৃষি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা। এর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার ক্ষমতা বাড়ানো, উদাহরণস্বরূপ, চরম আবহাওয়া, খরা, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি। কার্যকরভাবে ভূমি ও জমির মান উন্নত করা।

মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, ভূমি, পানিসম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, শিল্প, অর্থ; স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

২.৫ ২০২০ সালের মধ্যে বীজ, চারাগাছ, গবাদি পশু ও বন্যপ্রাণীর জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বীজ ব্যাংক স্থাপন। আন্তর্জাতিক সমঝোতা অনুযায়ী জিনগত এবং সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যগত জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত সুবিধার ক্ষেত্রে যথাযথ ও সমান অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হবে।

মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ৫ নভেম্বর ২০১৫ শেরেবাংলা নগরে এনইসি অডিটোরিয়ামে পরিকল্পনা কমিশন প্রণীত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের মোড়ক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল উপস্থিত ছিলেন – পিআইডি

সহ মূল দায়িত্বঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বাণিজ্য, পরিবেশ ও বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পররাষ্ট্র

২.এ উন্নত ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট সেবা, প্রযুক্তির বিকাশ, উদ্ভিদ ও পশুসম্পদ জিন ব্যাংক নির্মাণে বিনিয়োগ বাড়ানো। এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল এবং বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কৃষি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্বঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পররাষ্ট্র; বন বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

২.বি বিশ্ব কৃষিবাজারে বাণিজ্যের সীমাবদ্ধতা এবং বিকৃতি সংশোধন ও প্রতিরোধ করতে হবে। দোহা রাউন্ডের ঘোষণা অনুযায়ী, কৃষিজ পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সমান্তরাল সব ধরনের ভরতুকি ও নীতিমালা বর্জন করা।

মূল দায়িত্বঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি, পররাষ্ট্র , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; বন বিভাগ

২.সি ভোগ্যপণ্য সংশ্লিষ্ট বাজারের সুষ্ঠু কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়া। খাদ্যপণ্যের দামের চরম অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণে বাজার সংশ্লিষ্ট ও খাদ্যের মজুদ সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্বঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্বঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ তথ্য, জনপ্রশাসন; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যু হার প্রতি লাখে ৭০ জনের নিচে নামিয়ে আনা।

মূল দায়িত্বঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ তথ্য, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক; স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩.২ ২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও ৫ বছর বয়সের নিচে শিশুদের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু নাশ করা।

মূল দায়িত্বঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ শিল্প, তথ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষা, ম্যালেরিয়ার মতো মহামারি ও অবহেলিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগবালাই নাশ করা এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ মোকাবিলা করা।

মূল দায়িত্বঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ তথ্য, শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, যুব ও ক্রীড়া, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

৩.৪ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগে মৃত্যু হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা। মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্যের প্রসার ঘটানো।

মূল দায়িত্বঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ শিক্ষা, তথ্য, মহিলা ও শিশু বিষয়ক; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩.৫ চেতনানাশক ও অ্যালকোহলসহ ওষুধের অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা শক্তিশালী করা।

মূল দায়িত্বঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; তথ্য, ধর্ম, যুব ও ক্রীড়া

৩.৬ ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

মূল দায়িত্বঃ সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, তথ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সেতু বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৩.৭ ২০৩০ সালের মধ্যে যৌন ও প্রজননসংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবায় সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। পরিবার পরিকল্পনা, তথ্যপ্রযুক্তি ও শিক্ষা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য জাতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচির আওতার মধ্যে নিয়ে আসা।

মূল দায়িত্বঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ শিক্ষা, তথ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান, ধর্ম; স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩.৮ সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা অর্জন। সকলের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা, অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ, কার্যকরী, মানসম্মত এবং সাশ্রয়ী মূল্যে অপরিহার্য ওষুধ ও টিকাদানের সুবিধা নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্বঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বাণিজ্য, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন), শিল্প (বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড); ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ), স্থানীয় সরকার বিভাগ

৩.৯ ২০৩০ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও বায়ু, পানি এবং ভূমিদূষণ ও সংক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা।

মূল দায়িত্বঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শ্রম ও কর্মসংস্থান; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩.এ দেশভেদে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার কঠোর প্রয়োগ।

মূল দায়িত্বঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ তথ্য, স্বরাষ্ট্র

৩.বি সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের টিকা ও ওষুধ তৈরির গবেষণায় সহায়তা করা। প্রাথমিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব। তাই এসব দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ ও টিকা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। দোহা ঘোষণা মতে, গণস্বাস্থ্য রক্ষায় টিআরআইপি বা মেধা সম্পত্তি বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী পূর্ণ সুবিধা পাবে উন্নয়নশীল দেশগুলো, বিশেষ করে সকলের জন্য ওষুধের প্রাপ্য নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বাণিজ্য, পররাষ্ট্র

৩.সি উন্নয়নশীল বিশেষ করে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল ছোটো দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন বাড়ানো এবং এ খাতে সংশ্লিষ্টদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: জনপ্রশাসন; বন বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩.ডি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির ক্ষেত্রে আগাম সতর্ক বার্তা, ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সব দেশের, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র, তথ্য, শিল্প; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৪.১ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যথার্থ, মানসম্মত ও ফলপ্রসূ শিক্ষা নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মহিলা ও শিশু বিষয়ক, তথ্য, সমাজকল্যাণ, ধর্ম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া; স্থানীয় সরকার বিভাগ,পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৪.২ ২০৩০ সালের মধ্যে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে শৈশব বিকাশ, যত্ন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা। প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

মূল দায়িত্ব: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, ধর্ম; স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষ সবার জন্য কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং উচ্চতর এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।

মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বন বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শ্রম ও কর্মসংস্থান, যুব ও ক্রীড়া, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, শিল্প (বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র, বিটাক), বস্ত্র ও পাট; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৪.৪ কর্মসংস্থান, ভালো চাকরি কিংবা উদ্যোক্তা তৈরিতে, ২০৩০ সালের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসম্পন্ন যুব ও প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা পর্যাপ্ত হারে বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শ্রম ও কর্মসংস্থান, যুব ও ক্রীড়া, শিল্প, তথ্য; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বন বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

৪.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা। সব ধরনের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অসহায়, অক্ষম ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং অরক্ষিত পরিস্থিতিতে থাকা শিশুদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, ধর্ম, যুব ও ক্রীড়া; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৪.৬ ২০৩০ সালের মধ্যে যুবসহ পর্যাপ্ত হারে প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহ **মূল দায়িত্ব:** শিক্ষা মন্ত্রণালয়,

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মহিলা ও শিশু বিষয়ক, যুব ও ক্রীড়া, তথ্য, ধর্ম, সমাজকল্যাণ; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৪.৭ টেকসই উন্নয়নে সব শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করা। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রা, মানবাধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসার সংস্কৃতি, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞাপন ও দক্ষতা অর্জন।

মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সংস্কৃতি বিষয়ক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, ধর্ম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পরিবেশ ও বন, শিল্প, পররাষ্ট্র ; বন বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ

৪.এ শিশু, অক্ষমতা এবং লিঙ্গ সংবেদনশীলতা বিবেচনায় রেখে শিক্ষা কাঠামোর নির্মাণ ও উন্নয়ন করা। সবার জন্য নিরাপদ, অহিংস, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক; আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪.বি ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ-বিশেষ করে স্বল্পোন্নত, ছোটো দ্বীপরাষ্ট্র এবং আফ্রিকার দেশগুলোর জন্য উচ্চতর শিক্ষায় বৃত্তির হার পর্যাপ্ত হারে বাড়ানো। উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, আইসিটি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত কর্মসূচিতে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, পররাষ্ট্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জনপ্রশাসন

৪.সি ২০৩০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত এবং ছোটো দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা পর্যাপ্ত হারে বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, পররাষ্ট্র; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৫. নারী-পুরুষের সমতা

৫.১ সর্বক্ষেত্রে নারীদের ওপর সবধরনের বৈষম্য দূর করা।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র, শিল্প, পররাষ্ট্র, শ্রম ও কর্মসংস্থান, ধর্ম বিষয়ক, বস্ত্র ও পাট; আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৫.২ ঘরের ভেতরে কিংবা বাইরে নারীদের ওপর সবধরনের সহিংসতা পরিহার করা। নারী পাচার ও যৌন নিপীড়নসহ সব ধরনের নির্যাতন বন্ধ করা।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পররাষ্ট্র, শ্রম ও কর্মসংস্থান, ধর্ম , বস্ত্র ও পাট; আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৫.৩ বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহসহ সব ধরনের ক্ষতিকারক চর্চা পরিহার করা।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র, তথ্য, ধর্ম, পররাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৫.৪ সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক ও গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন করা। পরিবার ও পারিবারিক দায়িত্ব বণ্টনের বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে উপযুক্ত করে তুলে ধরা।

মূল দায়িত্ব: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শ্রম ও কর্মসংস্থান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, অর্থ ; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনজীবনে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে নারীর অংশগ্রহণ ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: জনপ্রশাসন, শিল্প; আইন ও বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ

৫.৬ আইসিপিডি'র প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন এবং বেইজিং প্লাটফর্ম অব অ্যাকশনের সমঝোতা অনুযায়ী, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকারে নারীদের সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পররাষ্ট্র; আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৫.এ নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক সম্পদ, সম্পত্তির উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়া।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ভূমি; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

৫.বি নারীর ক্ষমতায়নে প্রযুক্তি-বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, শিল্প; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৫.সি সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ জোরদার করা।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন)

৬. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

৬.১ ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী খাবার পানির ক্ষেত্রে সার্বজনীন ও সমান অধিকার অর্জন।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিল্প (বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড); পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৬.২ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও ন্যায়সংগত স্বাস্থ্যবিধি অর্জন করা। খোলা জায়গায় মলত্যাগ পরিহার করা। নারী-মেয়ে ও অসহায়দের চাহিদার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, তথ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, অর্থ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পরিবেশ ও বন; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৬.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে দূষণের পরিমাণ কমিয়ে, আবর্জনা না ফেলে এবং রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণের হার কমিয়ে পানির গুণাগুণ বাড়ানো। বিশ্বজুড়ে অপরিশোধিত বর্জ্য পানির পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে এনে, একে পুনঃব্যবহারযোগ্য করে নিরাপদ গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিল্প, পররাষ্ট্র, বস্ত্র ও পাট, অর্থ, পানিসম্পদ, নৌপরিবহণ

৬.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে সব খাতে পানি ব্যবহারের কার্যকারিতা পর্যাপ্ত হারে বাড়ানো। বিশুদ্ধ পানির ঘাটতি পূরণে টেকসই উত্তোলন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা। পানির সংকটে ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা পর্যাপ্ত হারে কমিয়ে আনা।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: নৌপরিবহণ, পানিসম্পদ, পররাষ্ট্র

৬.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে পানিসম্পদ ব্যবহারের সমন্বিত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা। উপযুক্ত পানি সরবরাহে আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতাও এর আওতায় আনা।

মূল দায়িত্ব: পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ

৬.৬ পাহাড়, বন, জলাভূমি, নদী, ভূ-অভ্যন্তরের জল এবং জলাশয়সহ পানির উৎস সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা।

মূল দায়িত্ব: পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৬.এ পানি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। পানি সংগ্রহণ, নির্লবণীকরণ, পানির দক্ষ ব্যবহার, বর্জ্যপানি পরিশোধন, পুনঃব্যবহারযোগ্য ও পুনঃব্যবহার প্রযুক্তির মাধ্যমে সহযোগিতা ও দক্ষতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র, শিল্প; স্থানীয় সরকার বিভাগ

৬.বি পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ জোরদার করা।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: জনপ্রশাসন, পানিসম্পদ; কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), স্থানীয় সরকার বিভাগ

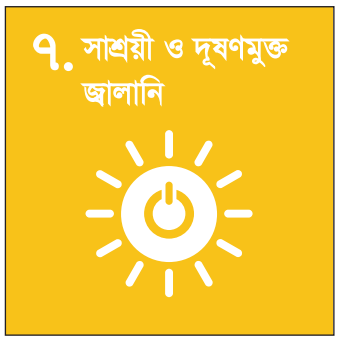

৭.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং আধুনিক জ্বালানি সেবার অধিকার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: বিদ্যুৎ বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পররাষ্ট্র; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৭.২ বৈশ্বিক মিশ্র জ্বালানিতে ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ পর্যাপ্ত হারে বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: বিদ্যুৎ বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৭.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি শক্তির দক্ষতা দ্বিগুণ হারে বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: বিদ্যুৎ বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন

৭.এ ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো। যেমন, নবায়নযোগ্য জ্বালানির দক্ষতা এবং উন্নততর ও পরিবেশবান্ধব জৈব জ্বালানি প্রযুক্তির প্রসার। জ্বালানি অবকাঠামো ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রযুক্তিতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), বাংলাদেশ ব্যাংক

৭.বি ২০৩০ সালের মধ্যে সকলকে আধুনিক ও টেকসই জ্বালানি সেবার আওতায় আনতে, উন্নয়নশীল বিশেষ করে স্বল্পোন্নত ও ছোটো দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে জ্বালানি অবকাঠামোর সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধন করা।

মূল দায়িত্ব: বিদ্যুৎ বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র, শিল্প (বিএসটিআই), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, তথ্য অধিদফতর

৮.১ জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা। বিশেষ করে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কমপক্ষে ৭ শতাংশ রাখা।

মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন, ব্যাণিজ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শিল্প, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (বাংলাদেশ ব্যাংক), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সেতু বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৮.২ অর্থনীতিতে উৎপাদনের উচ্চ হার অর্জন করা। উচ্চ মূল্য ও শ্রমঘন খাতকে বিবেচনায় রেখে বৈচিত্র্য, প্রযুক্তিগত বিকাশ ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

মূল দায়িত্ব: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শ্রম ও কর্মসংস্থান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বস্ত্র ও পাট, পানিসম্পদ, শিক্ষা; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৮.৩ উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা তৈরি, সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনে সহায়ক, এমন উন্নয়নবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন করা। ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি ধরনের উদ্যোগকে স্বীকৃতিদান ও প্রবৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা। তাদের আর্থিক সেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যুব ও ক্রীড়া; কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও উন্নয়ন ইনিস্টিটিউট, তথ্য অধিদফতর, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৮.৪ ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে সম্পদের ভোগ-উৎপাদনের হার গতিশীল করা। ১০ বছর মেয়াদি ফ্রেমওয়ার্ক কর্মসূচির আলোকে পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রভাব থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিষয়টি আলাদা করা।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, অর্থ, পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র, শিল্প; বাংলাদেশ ব্যাংক

৮.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পূর্ণ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও ভালো কাজের সক্ষমতা অর্জন করা। বিশেষ করে যুব, অক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে একই মানের কাজের জন্য সমান পারিতোষিক নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পররাষ্ট্র, শিল্প, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, যুব ও ক্রীড়া, শিক্ষা; লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৮.৬ ২০২০ সালের মধ্যে বেকার এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষিত না হওয়া তরুণ-যুবাদের সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্য হারে হ্রাস করা।

মূল দায়িত্ব: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শিল্প, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৮.৭ শিশু শ্রমের মতো নিকৃষ্ট শ্রমের অনুশীলন বন্ধ ও পরিহারে তড়িৎ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। বলপূর্বক শ্রমের বিনাশ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুদের সেনা হিসেবে ব্যবহার ও তাদের নিয়োগসহ সব ধরনের শিশু শ্রমের ইতি টানা।

মূল দায়িত্ব: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, যুব ও ক্রীড়া, সমাজকল্যাণ; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৮.৮ অভিবাসী শ্রমিক, বিশেষ করে নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে থাকা শ্রমিকসহ সকলের শ্রম অধিকার রক্ষা এবং তাদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ তৈরি করা।

মূল দায়িত্ব: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাট; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৮.৯ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই পর্যটনের প্রসারে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্যের প্রসার ঘটানো।

মূল দায়িত্ব: বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, তথ্য, রেলপথ, পরিবেশ ও বন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক; স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৮.১০ গৃহস্থালি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা জোরদারের মাধ্যমে সকলের জন্য ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক সেবাকে উৎসাহিত করা ও তাদের প্রবেশাধিকার প্রসারিত করা।

মূল দায়িত্ব: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বাংলাদেশ ব্যাংক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

৮.এ উন্নয়নশীল, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে, উন্নত-সমন্বিত কাঠামোর ব্যবহারসহ (এনহ্যান্সড ইন্টিগ্রেটেড ফ্রেমওয়ার্ক ফর এলডিসিজি) সহায়তা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৮.বি ২০২০ সালের মধ্যে যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে একটি বৈশ্বিক কৌশলের উন্নয়ন ও কার্যকর করা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার গ্লোবাল জবস প্যাক্ট বা চুক্তি বাস্তবায়ন করা।

মূল দায়িত্ব: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পররাষ্ট্র, শ্রম ও কর্মসংস্থান; কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৯.১ অর্থনৈতিক উন্নতি ও মানবজাতির কল্যাণে আঞ্চলিক ও আন্তঃসীমান্ত ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও স্থিতিশীল অবকাঠামোর বিকাশ ঘটানো। সবার জন্য ব্যবহারযোগ্য ও সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত, রেলপথ, নৌপরিবহণ, শিল্প, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, ভূমি, পররাষ্ট্র; সেতু বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য অধিদফতর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি)

৯.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রসার ঘটানো। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থান

ও প্রবৃদ্ধিতে শিল্পকারখানার অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ানো। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এর অংশীদার দ্বিগুণ করা।

মূল দায়িত্ব: শিল্প মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট; বন বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৯.৩ আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুযোগ তৈরি করা। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে কম সুদে ঋণ প্রদানসহ সমন্বিত বাজারে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা।

মূল দায়িত্ব: শিল্প মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য; বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৯.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে অবকাঠামোর উন্নতি সাধন করা। দেশভেদে সক্ষমতা অনুযায়ী শিল্পকারখানাগুলোর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা। সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো এবং নিরাপদ ও পরিবেশ সহায়ক উন্নত প্রযুক্তি ও উদ্যোগ অবলম্বন করে টেকসই শিল্প বিকশিত করা।

মূল দায়িত্ব: শিল্প মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: নৌপরিবহণ, রেলপথ, কৃষি, পররাষ্ট্র; সেতু বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

৯.৫ সব দেশে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিজ্ঞানমূলক গবেষণা বাড়ানো, শিল্প খাতে প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নততর করা। ২০৩০ সাল নাগাদ উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সহ. মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, শিল্প, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন)

৯.এ আফ্রিকাসহ উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে টেকসই ও স্থিতিশীল অবকাঠামোগত উন্নয়নে আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহায়তা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: রেলপথ; সেতু বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য অধিদফতর, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

৯.বি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তির উন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবনে সহায়তা করা। শিল্পবৈচিত্র্য ও পণ্যমানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি সহায়ক নীতির পরিবেশ নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, শিল্প, রেলপথ, নৌপরিবহণ, শিল্প (পেটেন্ট ডিজাইন ট্রেড মার্ক অধিদফতর), বস্ত্র ও পাট; সেতু বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য অধিদফতর, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৯.সি স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ্যযোগ্য হারে বাড়ানো এবং ২০২০ সালের মধ্যে ইন্টানেটের সার্বজনীন ও সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: রেলপথ; তথ্য কমিশন

১০.১ ২০৩০ সালের মধ্যে জনসংখ্যার নিম্ন আয়ের নিচে থাকা ৪০ শতাংশ মানুষের আয়ের হার, জাতীয় গড় আয়সীমার চেয়ে বেশি অর্জন করা এবং অর্জিত হার বজায় রাখা।

মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, সংস্কৃতি বিষয়ক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক; বন বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন)

১০.২ ২০৩০ সালের মধ্যে বয়স-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-অক্ষমতা-অর্থনৈতিক অবস্থাসহ অন্যান্য মর্যাদা নির্বিশেষে সকলের ক্ষমতায়ন এবং সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, সংস্কৃতি বিষয়ক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, জনপ্রশাসন, ধর্ম, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, শিল্প (বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র, বিটাক), পররাষ্ট্র; বন বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১০.৩ বৈষম্যমূলক আইন, নীতিমালা ও অনুশীলন বা চর্চা পরিহার করে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং ফলাফলের অসাম্য কমানো। এক্ষেত্রে যথাযথ আইন, নীতিমালা ও কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা।

মূল দায়িত্ব: আইন ও বিচার বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: জনপ্রশাসন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পররাষ্ট্র; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১০.৪ বিশেষ করে আর্থিক, মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক

নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বৃহত্তর সমতা অর্জন।

মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শ্রম ও কর্মসংস্থান, সমাজকল্যাণ; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১০.৫ বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক বাজার ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ উন্নত করা এবং এ জাতীয় বিধানের কঠোর বাস্তবায়ন করা।

মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

১০.৬ বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বেশি করে উপস্থাপন ও তাদের কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া। এর মাধ্যমে আরো কার্যকর, বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্লেষণযোগ্য ও বৈধ প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।

মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ,

সহ মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বাণিজ্য, পররাষ্ট্র

১০.৭ পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় অভিবাসন নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত এবং দায়িত্বশীলতার সাথে মানুষের অভিবাসন ও গতিশীলতা সহজ করা।

মূল দায়িত্ব: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, তথ্য, জনপ্রশাসন, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন

১০.এ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী উন্নয়নশীল বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যমূলক ব্যবস্থানীতি বাস্তবায়ন।

মূল দায়িত্ব: বাণিজ্য

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র

১০.বি বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক প্রবাহ ও সরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহায়তার প্রসার ঘটানো। বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, আফ্রিকা, ছোটো দ্বীপরাষ্ট্র ও স্থলসীমাবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের জাতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচি অনুযায়ী পদক্ষেপগুলোর সফল বাস্তবায়ন করা।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১০.সি ২০৩০ সালের মধ্যে অভিবাসীদের পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্সের বিনিময় খরচ তিন শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা। ৫ শতাংশের বেশি খরচ হয়, এমন রেমিট্যান্স করিডর বিলুপ্ত করা।

মূল দায়িত্ব: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

১১.১ সবার জন্য পর্যাপ্ত এবং নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন ও মৌলিক সেবা নিশ্চিত করা। ঘিঞ্জি বস্তির উন্নতি সাধন করা।

মূল দায়িত্ব: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১১.২ ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সহজগম্য এবং টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ করে দেওয়া।

মূল দায়িত্ব: সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: রেলপথ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র, নৌপরিবহণ, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, তথ্য; স্থানীয় সরকার বিভাগ, সেতু বিভাগ

১১.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে সব দেশে সার্বিক ও টেকসই নগরায়ণ বাড়ানো। অংশগ্রহণমূলক, সমন্বিত ও টেকসই মানব বসতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ভূমি; স্থানীয় সরকার বিভাগ

১১.৪ বিশ্বের সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যগুলো রক্ষা এবং নিরাপদে রাখতে প্রচেষ্টা জোরদার করা।

মূল দায়িত্ব: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, ধর্ম , যুব ও ক্রীড়া, পররাষ্ট্র, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন

১১.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে পানি সম্পর্কিত নানা দুর্যোগের কারণে নিহত এবং আক্রান্তদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা। জিডিপি সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা। বিশেষ করে গুরুতর দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে থাকা মানুষকে রক্ষা করা।

মূল দায়িত্ব: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র, নৌপরিবহণ, পানিসম্পদ, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

১১.৬ ২০৩০ সালের মধ্যে শহরের মাথাপিছু প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাব কমানো। বায়ুর গুণাগুণ, নগরশাসন ব্যবস্থা ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, শিল্প; বিদ্যুৎ বিভাগ

১১.৭ ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, ব্যবহারযোগ্য ও গাছপালাসমৃদ্ধ পাবলিক স্পেস বা গণ স্থানের সুবিধা নিশ্চিত করা। বিশেষভাবে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, ভূমি, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক

১১.এ জাতীয় এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জোরদারের মাধ্যমে নগর, নগরাঞ্চল আর পল্লি এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সংযোগের ইতিবাচক সমন্বয় সাধন।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন; কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, তথ্য অধিদফতর, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১১.বি ২০২০ সালের মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতাসম্পন্ন শহর ও মানব বসতির উল্লেখযোগ্য হারে বিস্তার ঘটানো। জলবায়ুর প্রভাব ও দুর্যোগ মোকাবিলায় অন্তর্ভুক্তিমূলক, সম্পদের দক্ষতা এবং প্রশমন ও অভিযোজনের মাধ্যমে সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ। সকল স্তরে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহ. মূল দায়িত্ব: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, গৃহায়ন ও গণপূর্ত; কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন)

১১.সি আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্যের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে টেকসই ও স্থিতিশীল ভবন নির্মাণে সহায়তা করা।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র, গৃহায়ন ও গণপূর্ত

১২.১ টেকসই ভোগ-উৎপাদনের ১০ বছর মেয়াদি ফ্রেমওয়ার্ক কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন ও সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে, উন্নত দেশগুলোর নেতৃত্বে সব দেশকে এ পদক্ষেপ নিতে হবে।

মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, শিল্প, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, অর্থ; বন বিভাগ

১২.২ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পানিসম্পদ, শিল্প, ভূমি; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১২.৩ খুচরা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু খাদ্য বিনষ্ট হওয়ার পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনা। ফসল সংগ্রহ পরবর্তী লোকসানসহ উৎপাদন এবং বিপণনে খাদ্যে লোকসান কমানো।

মূল দায়িত্ব: অর্থ মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য, বাণিজ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১২.৪ আন্তর্জাতিক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি অনুযায়ী রাসায়নিক ও সব ধরনের বর্জ্যের পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। বায়ু, পানি ও ভূমিতে এগুলোর নিঃসরণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমানো। স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর এর বিরূপ প্রভাব হ্রাস করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, বস্ত্র ও পাট; স্থানীয় সরকার বিভাগ

১২.৫ প্রতিরোধ, হ্রাস এবং পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্য তৈরির পরিমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণে কমিয়ে আনা।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, শিল্প; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১২.৬ টেকসই চর্চা গ্রহণে বৃহৎ ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করা। তাদের প্রতিবেদন চক্রে টেকসই কর্মকাণ্ডের তথ্য সংযোজনে উদ্বুদ্ধ করা।

মূল দায়িত্ব: শিল্প মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, বাণিজ্য, পররাষ্ট্র

১২.৭ জাতীয় নীতিমালা ও গুরুত্ব অনুসারে টেকসই সরকারি সংগ্রহমূলক অনুশীলনের প্রসার ঘটানো।

মূল দায়িত্ব: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট)

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত, পানিসম্পদ, শিল্প, রেলপথ, শিক্ষা; সেতু বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

১২.৮ ২০৩০ সালের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে, সকলেই প্রকৃতিবান্ধব টেকসই উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার তথ্য জানে এবং এ সম্পর্কে তারা সচেতন।

মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, শিল্প (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট), তথ্য; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১২.এ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা জোরদারে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করা। ভোগ-উৎপাদনের আরও টেকসই পন্থা অবলম্বনে তাদের সহায়তা করা।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, শিল্প, বাণিজ্য

১২.বি টেকসই পর্যটনের ওপর টেকসই উন্নয়নের প্রভাব

পর্যবেক্ষণের জন্য সরঞ্জামের উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন।

মূল দায়িত্ব: বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সংস্কৃতি বিষয়ক, পরিবেশ ও বন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক

১২.সি জাতীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় বাজারে অস্থিতিশীলতা ঠেকাতে জৈব জ্বালানিতে যুক্তিসংগত ভরতুকি নির্ধারণ করা। পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, এমন সব পণ্যের কর প্রক্রিয়া পুনর্গঠন ও ভরতুকি তুলে নেওয়া। উন্নয়নশীল দেশগুলোর নির্দিষ্ট চাহিদা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে এসব পদক্ষেপ নিতে হবে। এর প্রভাবে তাদের উন্নয়ন যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে এবং রক্ষা করতে হবে দরিদ্র এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে।

মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ

১৩.১ সব দেশে জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থিতিশীলতা ও অভিযোজনের সক্ষমতা শক্তিশালী করা।

মূল দায়িত্ব: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, স্বরাষ্ট্র (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর), জনপ্রশাসন, প্রতিরক্ষা; স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৩.২ জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত পদক্ষেপ সংযুক্ত করা।

মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, পররাষ্ট্র; কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন)

১৩.৩ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব কমানো এবং আগাম সতর্ক বার্তা সম্পর্কিত শিক্ষা ও সচেতনতা এবং মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ:: শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, তথ্য, শিল্প (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট), প্রতিরক্ষা; স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৩.এ ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ইউএনএফসিসিসি অনুযায়ী উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদা পূরণে ২০২০ সালের মধ্যে যৌথভাবে বছরে ১ হাজার কোটি ডলার সহায়তা দেওয়া। কার্যকরী দুর্যোগ প্রশমন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার সাথে এ অর্থের ব্যবহার করা। যত দ্রুত সম্ভব অর্থায়নের মাধ্যমে সবুজ জলবায়ু তহবিল বা গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড সচল বা কার্যকর করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

১৩.বি স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব মোকাবিলায় দক্ষতা বাড়ানোর প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা। গুরুত্ব দিতে হবে নারী, যুব, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিল্প; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

১৪.১ ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ করা এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমানো। বিশেষ করে স্থলভিত্তিক কর্মকাণ্ড, সামুদ্রিক আবর্জনা ও পুষ্টি সংক্রান্ত দূষণের মাত্রা কমানো।

মূল দায়িত্ব: পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রতিরক্ষা (বাংলাদেশ নৌবাহিনী), পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, নৌপরিবহণ, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

১৪.২ ২০২০ সাল নাগাদ টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমুদ্র এবং উপকূলীয় পরিবেশকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা। সাগরের রিজিলিয়ান্স বা স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার ক্ষমতা বাড়ানো। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ পুনরুদ্ধার করে সুস্থ ও সমৃদ্ধশালী সাগর-মহাসাগর নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র (বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পররাষ্ট্র

১৪.৩ উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সহযোগিতার মাধ্যমে ওশান এসিডিফিকেশান বা সাগরে এসিডের মাত্রা কমানো। এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সকল পর্যায়ে সচেতনতা তৈরি করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পররাষ্ট্র , নৌপরিবহণ, শিল্প, প্রতিরক্ষা; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৪.৪ ২০২০ সাল নাগাদ সমুদ্রিক সম্পদ আহরণে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। অতিরিক্ত মাছ ধরা, অবৈধ, অপ্রকাশ্য, নিয়ন্ত্রণহীন ও ধ্বংসাত্মকভাবে মাছ ধরার চর্চা বন্ধ করা। বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে সাগরের মৎস্য সম্পদ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা। যাতে করে, মাছের জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।

মূল দায়িত্ব: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রতিরক্ষা (বাংলাদেশ নৌবাহিনী), স্বরাষ্ট্র ; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৪.৫ ২০২০ সালের মধ্যে সাগর উপকূলের অন্তত ১০ শতাংশ অঞ্চল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ করা।

মূল দায়িত্বঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহ **মূল দায়িত্বঃ** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ প্রতিরক্ষা (বাংলাদেশ নৌবাহিনী), পররাষ্ট্র ,স্বরাষ্ট্র , নৌপরিবহণ

১৪.৬ বিশেষ সুবিধা নিয়ে অতিরিক্ত মাছ ধরার চর্চা নিষিদ্ধ করা। অবৈধ, অপ্রকাশ্য আর অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণকে নিরুসাহিত করা। এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উপযুক্ত এবং বিশেষ ধরনের সুবিধার দিকটি খেয়াল রাখতে হবে; যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভরতুকি চুক্তির একটি অংশ।

মূল দায়িত্বঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্বঃ প্রতিরক্ষা (বাংলাদেশ নৌবাহিনী)

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বন বিভাগ, বাণিজ্য, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র

১৪.৭ ছোটো দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩০ সাল নাগাদ তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়ানো। সমুদ্রে মৎস্য, জলজ জীব উৎপাদন এবং তাদের পর্যটনের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্বঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বেসামরিক বিমান ও পর্যটন; স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৪.এ সাগর-মহাসাগর বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বাড়ানো এবং গবেষণার উন্নয়ন ও সামুদ্রিক প্রযুক্তির আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এসব কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হবে আন্তঃসরকার সমুদ্রবিজ্ঞান কমিশনের মানদণ্ড এবং নির্দেশনা অনুযায়ী। সামুদ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে উন্নয়নশীল এবং ছোটো দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নতিতে সাগর সম্পদের ভূমিকা বাড়ানো যায়।

মূল দায়িত্বঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্বঃ নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ; বন বিভাগ

১৪.বি ক্ষুদ্র পরিসরে মাছ আহরণকারী জেলেদের সামুদ্রিক সম্পদ এবং বাজারে প্রবেশাধিকার দেওয়া।

মূল দায়িত্বঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র (বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড)

১৪.সি আন্তর্জাতিক আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। ইউএনসিএলওএস বা সাগর আইন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন অনুসারে, আঞ্চলিক কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাগর-মহাসাগর এবং এর সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়ন করা।

মূল দায়িত্বঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পরিবেশ ও বন, স্বরাষ্ট্র , নৌপরিবহণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

১৫.১ ২০২০ সালের মধ্যে স্থল এবং এর জলজ পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করে বনাঞ্চল, জলাভূমি, পার্বত্য অঞ্চল এবং শুষ্ক ভূমির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্বঃ পরিবেশ ও বন

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, ভূমি, পানিসম্পদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, নৌপরিবহণ

১৫.২ ২০২০ সালের মধ্যে সব ধরনের বনাঞ্চলের টেকসই ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা। বন উজাড় রোধ এবং ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার করা। বিশ্বজুড়ে বনায়ন এবং বৃক্ষরোপণের পরিমাণ বাড়ানো।

মূল দায়িত্বঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ভূমি, তথ্য; স্থানীয় সরকার বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১৫.৩ ২০২০ সালের মধ্যে মরুকরণ মোকাবিলা করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি ও মাটি পুনরুদ্ধার করা। মরুকরণ, খরা ও বন্যায় আক্রান্ত ভূমি পুনরুদ্ধার করে ভূমি-ক্ষয়হীন বিশ্ব অর্জন করা।

মূল দায়িত্বঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্বঃ ভূমি মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি, পানিসম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ; স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৫.৪ পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা। পার্বত্য পরিবেশের সক্ষমতা বাড়িয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্বঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন, ভূমি; স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৫.৫ প্রাকৃতিক আবাসের ক্ষয় হ্রাসে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া। জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস রোধ করা এবং ২০২০ সাল নাগাদ হুমকির মুখে পড়া প্রজাতিগুলোকে বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা।

মূল দায়িত্বঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, কৃষি, তথ্য

১৫.৬ জেনেটিক বা জিনগত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য ও সমবণ্টন নিশ্চিত করা। জিনগত সম্পদ ব্যবহারের যথাযথ সুযোগ তৈরি করা।

মূল দায়িত্বঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১৫.৭ স্থল এবং জলজ প্রজাতির চোরা শিকার ও পাচার বন্ধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া। বন্য প্রাণীজাত অবৈধ পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ বন্ধে সচেতনতা তৈরি করা।

মূল দায়িত্বঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বরাষ্ট্র ; আইন ও বিচার

১৫.৮ ২০২০ সাল নাগাদ স্থল ও জলজ পরিবেশে আগ্রাসী অচেনা প্রজাতির উপস্থিতি রোধ করা এবং এদের প্রভাব পর্যাপ্ত পরিমাণে হ্রাস করা। আগ্রাসী প্রজাতিগুলো নিয়ন্ত্রণ অথবা ধ্বংস করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

১৫.৯ ২০২০ সাল নাগাদ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া, দারিদ্র্যবিমোচন কৌশলসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের বিষয়গুলো একীভূত করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

১৫.এ জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে সকল উৎস থেকে আর্থিক সম্পদের যোগান দেওয়া এবং সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র, পরিবেশ ও বন

১৫.বি টেকসই বন ব্যবস্থাপনার অর্থায়নে সব পর্যায়ে এবং সকল উৎস থেকে উল্লেখযোগ্য হারে সম্পদের যোগান নিশ্চিত করা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও পুনঃবনায়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র ; বন বিভাগ

১৫.সি চোরা শিকার এবং সংরক্ষিত প্রজাতির পাচার বন্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা বাড়ানো। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৬.১ সব ধরনের সহিংসতা এবং এ সংক্রান্ত মৃত্যুর হার কমানো।

মূল দায়িত্ব: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মহিলা ও শিশু বিষয়ক, সমাজকল্যাণ; জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১৬.২ নির্যাতন, শোষণ, পাচারসহ শিশুদের ওপর সব ধরনের সহিংসতা ও অত্যাচার বন্ধ করা।

মূল দায়িত্ব: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পররাষ্ট্র, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা, তথ্য; জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আইন ও বিচার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৬.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। সবার জন্য সমান বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: আইন ও বিচার বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র , জনপ্রশাসন; জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল

১৬.৪ ২০৩০ সালের অবৈধ অর্থ ও অস্ত্রের প্রবাহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা। চোরাই সম্পদ পুনরুদ্ধার ও ফেরত পাওয়ার প্রক্রিয়া জোরদার করা। সব ধরনের সংঘবদ্ধ অপরাধ মোকাবিলা করা।

মূল দায়িত্ব: বাংলাদেশ ব্যাংক

সহ মূল দায়িত্ব: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র ; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন

১৬.৫ সবধরনের দুর্নীতি ও ঘুষ পর্যাপ্ত পরিমাণে হ্রাস করা।

মূল দায়িত্ব: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য, ধর্ম, জনপ্রশাসন, পররাষ্ট্র; দুর্নীতি দমন কমিশন, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য কমিশন

১৬.৬ সকল পর্যায়ে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ঘটানো।

মূল দায়িত্ব: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র, জনপ্রশাসন; কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, নির্বাচন কমিশন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য কমিশন, বন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন)

১৬.৭ সকল পর্যায়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সার্বিক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র, সমাজকল্যাণ; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, তথ্য কমিশন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৬.৮ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন পরিচালনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশগ্রহণ বাড়ানো ও জোরদার করা।

মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বন বিভাগ

১৬.৯ ২০৩০ সাল নাগাদ জন্মনিবন্ধনসহ সকলের বৈধ পরিচয় দেওয়া।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: নির্বাচন কমিশন

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৬.১০ তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা। জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক সমঝোতা অনুযায়ী মৌলিক অধিকার রক্ষা করা।

মূল দায়িত্বঃ তথ্য মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র , প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান; জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন

১৬.এ সহিংসতা পরিহার এবং সন্ত্রাসবাদ ও অপরাধ দমনে সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা। এদের বিরুদ্ধে লড়তে আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে সকল স্তরে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্বঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্বঃ জনপ্রশাসন

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র, শিল্প (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট); অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

১৬.বি টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্যহীন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা।

মূল দায়িত্বঃ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ স্বরাষ্ট্র; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৭.১ অভ্যন্তরীণ বা দেশীয় সম্পদের যোগান শক্তিশালী করা। কর ও অন্যান্য রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতার উন্নতি করা।

মূল দায়িত্বঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বন বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৭.২ উন্নত দেশগুলোকে তাদের সরকারি সহায়তা বা অফিশিয়াল ডেভলপমেন্ট অ্যাসিসট্যান্স-ওডিএ প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। ওডিএ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সামষ্টিক জাতীয় আয়ের ০.৭% এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলো পাবে ০.১৫-০.২০ শতাংশ পর্যন্ত।

মূল দায়িত্বঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র; বন বিভাগ

১৭.৩ বিভিন্ন উৎস থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বেশি পরিমাণে অর্থের যোগান দেওয়া।

মূল দায়িত্বঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র; বন বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বিনিয়োগ বোর্ড)

১৭.৪ ঋণের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা অর্জনে সমন্বিত নীতিমালার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করা। প্রয়োজন অনুসারে ঋণ প্রদান, ঋণ ছাড় ও ঋণ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা। চরম ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর ঋণের দুর্দশা কমাতে বৈদেশিক ঋণের সমন্বয় করা।

মূল দায়িত্বঃ বন বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র ; বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

১৭.৫ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিনিয়োগ বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

মূল দায়িত্বঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বিনিয়োগ বোর্ড)

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বাণিজ্য, পররাষ্ট্র ; বন বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, পাবলিক- প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

১৭.৬ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ব্যবহারের সুযোগ বাড়ানো। এক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং বহুমাত্রিক অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় উভয়পক্ষের সম্মতি অনুযায়ী উন্নত সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের আদান-প্রদান বৃদ্ধি করা; বিশেষ করে জাতিসংঘের পর্যায়ে। সমঝোতা অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রক্রিয়া আরো সহজ করা

মূল দায়িত্বঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র, শিল্প, বাণিজ্য; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

১৭.৭ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, বণ্টন, প্রচার ও বিস্তারের প্রসার ঘটানো। সহজ শর্তে এবং রেয়াতসহ বিশেষ সুবিধার বিনিময়ে এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করা।

মূল দায়িত্বঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বিনিয়োগ বোর্ড), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১৭.৮ ২০১৭ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য প্রযুক্তি বা টেকনোলজি ব্যাংক পুরোপুরি চালু করা। এসটিআই (Science, Technology Innovation) সক্ষমতা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রচলন করা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার আরো বৃদ্ধি করা।

মূল দায়িত্বঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্বঃ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পররাষ্ট্র, জনপ্রশাসন; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (এটুআই), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)

সক্ষমতা উন্নয়ন বা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং

১৭.৯ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কার্যকর ও কাঙ্ক্ষিত সক্ষমতা উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। টেকসই উন্নয়নের সকল লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে তাদের সহযোগিতা করা। নর্থ-নর্থ, সাউথ-সাউথসহ ত্রিমুখী আঞ্চলিক সহায়তা বৃদ্ধি করা।

মূল দায়িত্বঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহ মূল দায়িত্বঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ জনপ্রশাসন; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বন বিভাগ

বাণিজ্য

১৭.১০ দোহা উন্নয়ন এজেন্ডার সমঝোতা অনুযায়ী, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে একটি সার্বজনীন, নিয়মমাফিক, উন্মুক্ত, বৈষম্যহীন এবং বহুপক্ষীয় বাণিজ্য পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা।

মূল দায়িত্বঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্বঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ নভেম্বর ২০১৫ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন ধারা এগিয়ে নিতে সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান –পিআইডি

১৭.১১ উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানির পরিমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়ানো। ২০২০ সাল নাগাদ বিশ্ব রপ্তানিতে তাদের অবদান দ্বিগুণ করা।

মূল দায়িত্বঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্বঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বস্ত্র ও পাট; বাংলাদেশ ব্যাংক, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১৭.১২ স্বল্পোন্নত সকল দেশের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা বাস্তবায়ন করা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুসারে এসব দেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মগুলোর স্বচ্ছতা ও সহজ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। বাজারে তাদের জন্য প্রবেশাধিকার সুবিধা নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্বঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্বঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

পদ্ধতিগত সমস্যা ইস্যু

নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংগতি

১৭.১৩ নীতি সমন্বয় ও নীতি সংগতির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা।

মূল দায়িত্বঃ বন বিভাগ

সহ মূল দায়িত্বঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র ; বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১৭.১৪ নীতি সংগতি এবং টেকসই উন্নয়ন বাড়ানো

মূল দায়িত্বঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সহ মূল দায়িত্বঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র; বাংলাদেশ ব্যাংক, বন বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১৭.১৫ দারিদ্র্যবিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নে হাতে নেওয়া প্রতিটি দেশের নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান দেখানো।

মূল দায়িত্বঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বাণিজ্য; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বন বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১৭.১৬ টেকসই উন্নয়নের জন্য বহু-ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা। এর মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদের সরবরাহ ও আদান-প্রদান বাড়ানো এবং সব দেশের, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

মূল দায়িত্বঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্বঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ শিক্ষা , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাণিজ্য; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১৭.১৭ অংশীদারিত্বের অভিজ্ঞতা ও সংস্থান কৌশলের মাধ্যমে কার্যকরভাবে সরকারি-বেসরকারি এবং সুশীল সমাজভিত্তিক অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা এবং উন্নতি সাধন করা।

মূল দায়িত্বঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র ; বন বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ ব্যাংক, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

উপাত্ত, পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহি

১৭.১৮ ২০২০ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত ও ছোটো দ্বীপরাষ্ট্রসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতার উন্নয়নে সহায়তা বাড়ানো। উচ্চমানের, সময়োপযোগী এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা। জাতীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় আয়, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, অভিবাস, অক্ষমতা, ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্বঃ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, পরিবেশ ও বন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, অর্থ, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, পররাষ্ট্র, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বন বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

১৭.১৯ ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান কাঠামোর আলোকে অগ্রগতি পরিমাপকগুলোর উন্নতি সাধন করা। যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জিডিপির সাথে পরিপূরক এবং পরিসংখ্যা সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়ক।

মূল দায়িত্বঃ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বন বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

তথ্য সূত্র : টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পুস্তিকা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

নিবন্ধ

একুশের কারা-নির্যাতিত নারী

বাশার খান

রাষ্ট্রভাষা 'বাংলা' দাবির আন্দোলনে সহযোদ্ধা হয়ে পুরুষের পাশে নারীরাও অংশ নেয়। পাকিস্তান আর্মি-পুলিশের লাঠিচার্জ, গুলি ও গ্রেফতারের ভয় উপেক্ষা করে ভাষার দাবির মিছিলগুলোতে নারীরা ছিলেন সামনের কাতারে, অকুতোভয় হয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রাতে লুকিয়ে ভাষার দাবির বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত পোস্টার আঁকত। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে নারীরাই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে প্রথম ১৪৪ ধারা ভাঙে। সেদিন ১০ জন করে বের হওয়া প্রথম দুটি দলের অনেকেই গ্রেফতার হন। ছাত্ররা ব্যারিকেডের ওপর ও নিচ দিয়ে লাফিয়ে চলে যান। পরে তৃতীয় দলে বেরিয়ে ব্যারিকেড ধরে টানাটানির কাজ শুরু করেন ছাত্রীরাই। সেদিন পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার শেলে অনেক ছাত্রী আহত হন। এর মধ্যে রওশন আরা বাচ্চু, সারা তৈফুর, শামসুন, সুফিয়া ইব্রাহীম, সুরাইয়া ডলি, সুরাইয়া হাকিম ছিলেন।

সেদিনের আহতদের চিকিৎসায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা। আহতদের চিকিৎসা সাহায্যের জন্য বাসাবাড়িতে থাকা গৃহবধূরা ছাত্রীদের হাতে চাঁদা তুলে দেন। পুলিশের তাড়া খাওয়া ছাত্রদের নিজেদের কাছে লুকিয়ে রাখেন। আন্দোলনের খরচ চালানোর জন্য অনেক গৃহবধূ অলংকার খুলে দেন শহিদমিনারের পাদদেশে।

আন্দোলনে কোমলমতি কিশোরীরাও অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। সেসময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে থাকাকালীন একটি ঘটনায় আন্দোলনে কিশোরীদের অংশগ্রহণের দালিলিক উপাদান পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, 'আমাদের এক জায়গায় রাখা হয়েছিল জেলের ভিতর। যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচদিন আমরা জেলে ছিলাম, সকাল ১০টায় স্কুলের মেয়েরা ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হতো না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না'– নানা ধরনের স্লোগান। এই সময়ে শামসুল হক সাহেবকে আমি বললাম, 'হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।' হক সাহেব আমাকে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ মুজিব'।

বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ে অনেক নারীকেও জেল খাটতে হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় এবং সর্বোচ্চ পর্ব ১৯৫২ সাল। '৫২-র ঘটনার সময় নাদেরা বেগম পুলিশের গ্রেফতার এড়ানোর জন্য আত্মগোপন করেছিলেন। কবি সুফিয়া কামালের বোনের পরিচয়ে তাঁর বাসায় থাকতে শুরু করেন নাদেরা বেগম। বাসাটি ছিল বর্তমান পুরান ঢাকার হাটখোলার তারাবাগে। নাদেরা বেগমের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেওয়া হয় জাহানারা। মুনীর চৌধুরীর বোন ছিলেন এই নাদেরা। কিছুদিন পর ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। কারাগারে অন্য রাজবন্দিদের সঙ্গে তিনি কঠোর নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হন। তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সে সময় তিনি কিংবদন্তিতে পরিণত হন।

মহান একুশের কারাবরণকারী নারীদের মধ্যে অন্যতম আলোচিত ঘটনা নারায়ণগঞ্জের মর্গান হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম ও তাঁর ২ ছাত্রীসহ গ্রেফতার হওয়া। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে শহিদ হওয়ায় মমতাজ বেগম নারায়ণগঞ্জবাসীকে ভাষার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে উজ্জীবিত করেন। আন্দোলন করার দায়ে মমতাজ বেগমের সঙ্গে গ্রেফতার হওয়া তাঁরই ছাত্রী আয়েশা আক্তার খাতুন বেলু স্মৃতিচারণে বলেন– ২২ ফেব্রুয়ারি মমতাজ আপার ডাকে সবাই স্কুলে একত্রিত হলাম। ঢাকায় ছাত্র হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় তোলারাম কলেজের রিকুইজিশন করা জমিতে এক বিরাট জনসভা হয়। মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে আমাদের ছাত্ররা শহিদ হয়েছেন। আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম এই সভায় ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-জনগণকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথে নামার আহ্বান জানান। তিনি ঢাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ এবং ছাত্র ও জনসাধারণের ওপর পুলিশের গুলির প্রতিবাদ করে বলেন, 'বাংলা ভাষা আমাদের মায়ের ভাষা। এটা ওরা বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। আমাদের মুখের ভাষা যদি উর্দু হয়, বাঙালির সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যাবে'। তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমরা ছাত্রীরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথে নামি। ট্রাকে চড়ে মিছিল শুরু করলাম। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই/নুরুল আমীনের কল্লা চাই' স্লোগান দিতে দিতে শহর ঘুরলাম। একই ট্রাকে করে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও স্লোগান দিচ্ছে– শহরে একদম আলোড়ন পড়ে গেল।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ : প্রভাতফেরিতে ফেস্টুন হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা

মমতাজ বেগমের বক্তব্যে উজ্জীবিত হয়ে উঠে নারায়ণগঞ্জের ছাত্রছাত্রীরা। আপোশহীন নেতৃত্বের গুণাবলির কারণে মমতাজ বেগম এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেন যে, শুধু বাংলা ভাষার দাবির আন্দোলন করার অজুহাতে পুলিশের পক্ষে তাঁকে গ্রেফতার করা সহজ ছিল না। এজন্য হীন ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয় পাকিস্তান প্রশাসন। স্কুলের অর্থ আত্মসাৎ করার মিথ্যা অভিযোগ এনে স্কুলের গভর্নিং বোর্ড দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করানো হয়। আসল উদ্দেশ্য ছিল– নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনকে দুর্বল করা। এজন্য পুলিশ তাঁকে ১৯৫২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের খবর দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে নারায়ণগঞ্জ শহরে। ক্ষোভে ফুঁসে উঠে ছাত্র-যুবকরা। মমতাজ বেগমকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে অন্যদের সঙ্গে আদালত প্রাঙ্গণ ঘেরাও করে স্কুলছাত্রীরাও। মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার ও নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা অনুধাবন করা যায় ১ মার্চ ১৯৫২ তৎকালীন *আজাদ* পত্রিকার প্রতিবেদনে :

অদ্য প্রাতে স্থানীয় পুলিশ নারায়ণগঞ্জের মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করিয়া মহকুমা হাকিমের আদালতে হাজির করবার সংবাদ পাইয়া একদল ছাত্র ও নাগরিক আদালতের সম্মুখে হাজির হয় এবং বিনাশর্তে শিক্ষয়িত্রীর মুক্তি দাবি করিয়া 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি ধ্বনি করিতে থাকে। মহকুমা হাকিম জনাব ইমতিয়ারজী তখন বাহিরে আসিয়া ছাত্রদিগকে বলেন যে, শিক্ষয়িত্রীকে স্কুলের তহবিল আত্মসাতের দায়ে গ্রেফতার করা হইয়াছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সহিত তাঁর গ্রেফতারের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। কিন্তু জনতা তাহা বিশ্বাস না করিয়া বলিতে থাকে যে, মিসেস মমতাজ বেগম নারায়ণগঞ্জে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান কর্মী ছিলেন বলিয়াই পুলিশ তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে বিনাশর্তে মুক্তি না দিলে তাহারা কোর্ট প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া যাইবে না। পুলিশ তখন মৃদু লাঠিচার্জ করিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে।

বৈকালে পুলিশ মোটরযোগে মিসেস মমতাজ বেগমকে লইয়া ঢাকা রওয়ানা হইলে জনতা চাষাড়া স্টেশনের নিকটে তাহাদের গমন পথে বাধা দেয়। ইহাতে পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং পুলিশ পুনরায় লাঠিচার্জ করে। ফলে উভয়পক্ষে প্রায় ৪৫ জন আহত হয়। ...

৩ মার্চ ভারতের *দি স্ট্যাটম্যান* পত্রিকায় লিখে– One hundred and fifteen persons including two girls students have been arrested. So far in connection with the disturbances as Narayangonj that brook out after arrest of Mrs. Mamataz Begum, headmistress of the Morgan Girls High School on February 29.

মমতাজ বেগম উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন। পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জ ও সংঘর্ষের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে মমতাজ বেগম একসময় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আয়েশা আক্তার খাতুন জানান, একপর্যায়ে মমতাজ আপাকে ছাড়িয়ে নিতে পুলিশের সঙ্গে আমরা ধস্তাধস্তি শুরু করি। উনার আবার হাইপ্রেসার ছিল। টানাটানিতে পড়ে উনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পুলিশ তখন বলল, মমতাজ বেগমকে দ্রুত ঢাকায় হাসপাতালে নিতে হবে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা হয়– মমতাজ আপাকে সেবা করার জন্য দু-তিনজন মেয়েকে গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্য। তাঁর সেবা-শুশ্রূষার দরকার ছিল। আমি আর ফিরোজা মমতাজ আপার সঙ্গে গাড়িতে উঠি। অন্যরা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এগোতে থাকেন।

মমতাজ বেগমসহ গ্রেফতার ছাত্রীদেরকে রাখা হয় ঢাকা জেলের পাগলা গারদে। সেখানে আগে থেকেই গ্রেফতার ছিলেন নাচোলের রানী ইলা মিত্র। মমতাজ বেগমসহ গ্রেফতার ছাত্রীদেরকে রাজবন্দির মর্যাদা দেওয়ার জন্য জেলেই আন্দোলন শুরু করেন ইলা মিত্র। পরে জেল কর্তৃপক্ষ তাঁর দাবি মেনে নেয়।

জেলে ছাত্রীদেরকে সাধারণ হাজতিদের খাবার দিলে প্রতিবাদ করেন মমতাজ বেগম। তিনি জেলারকে বলেন, 'এই খাবার আমার মেয়েরা খাবে না। ওদের ভালো খাবার দেয়া হোক। আমার মেয়েদেরকে ভাল বিছানা দাও'। তারপর ছাত্রীদের জন্য ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে জেল কর্তৃপক্ষ।

পরে জেলবন্দি নারীদেরকে নিয়ে আরেক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় পুলিশ। মমতাজ বেগমসহ গ্রেফতারকৃতদেরকে বন্ড সই দিতে চাপ দিতে শুরু করে। 'তোমরা স্বেচ্ছায় ওই আন্দোলনে অংশ নেওনি। তোমাদেরকে জোর করে আনা হয়েছে'– এই বিবৃতি দিয়ে বন্ড সই দিলে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা বলা হয়। বিবৃতি এবং বন্ড সই দিতে অস্বীকৃতি জানান মমতাজ বেগমসহ গ্রেফতার ছাত্রীরা। এক মাস পর মমতাজ বেগমের ছাত্রী আয়েশা আক্তার খাতুন বেলু ও ফিরোজাকে আলাদা আলাদা দিনে কারাগার থেকে মুক্তি দেয় পুলিশ। কিন্তু মুক্তি মিলেনি আপোশহীন মমতাজ বেগমের।

বন্ড সই ইস্যুতে ফাটল ধরে মমতাজ বেগমের সংসারে। তাঁর স্বামী অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নাফ ছিলেন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি চেষ্টা করেছিলেন মমতাজ বেগম যেন সরকারের প্রস্তাব মেনে নেয়। কিন্তু দেশপ্রেমিক মমতাজ বেগম তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। যার কারণে আব্দুল মান্নাফকেও চাকরি হারাতে হয়। মমতাজ বেগমের মেয়ে সাহানা বেগম খুকু স্মৃতিচারণে লিখেন-

... তাঁদের ছিল সুখের সংসার। ... মা জেলে গেলে বাবার উপর সরকারিভাবে প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হয়, মা যেন মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং আর কোনো সময় আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করেন। ... বাবা মাকে বন্ড সই করে জেল থেকে বেরিয়ে আসার প্রস্তাব করলে মা তা অস্বীকার করেন। সেই থেকেই আমার মায়ের সাথে বাবার দূরত্ব ও দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বাবার সরকারি চাকরিরও শেষ রক্ষা হয়নি। মায়ের জেলজীবন এবং আন্দোলনের কারণে তাঁকেও চাকরি হারাতে হয়। পরে আইন পেশা শুরু করেন।

মমতাজ বেগম ১৯৫৩ সালের মে মাসে জেল থেকে মুক্তি পান। মুক্তির পর সামাজিক জীবন থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়। মর্গান স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর চাকরিটাও হারান। স্বামী তখন ফরিদপুরে চলে যান ওকালতি করতে। নারায়ণগঞ্জে একাই বেশ কিছুদিন থাকেন মমতাজ বেগম এবং ৫৪ সালে মমতাজ বেগম পুরান ঢাকায় চলে আসেন।

১৯৫৪ সাল, এল যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ যুক্তফ্রন্টের নেতারা নির্বাচনে মমতাজ বেগমকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেন। সাহানা বেগম খুকু জানান– ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে পুরনো ঢাকা থেকে মাকে নমিনেশন দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া চলতে থাকে। বাবা এ কথা জানতে পেরে মওলানা ভাসানী ও শেরে বাংলার সঙ্গে দেখা করেন। মাকে নমিনেশন না দেওয়ার জন্য তাঁদেরকে অনুরোধ করেন। বাবা তাঁদেরকে বলেন, এমনিতেই ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে আমার সংসার ভেঙে যাবার উপক্রম। আবার রাজনীতিতে জড়ালে আমার সংসার ভেঙে যাবে। আব্বার কান্নাকাটি ও অনুরোধের পর তাঁরা ব্যাপারটি বুঝতে সক্ষম হন এবং মাকে আর নমিনেশন দেওয়া হয়নি। স্বামী আব্দুল মান্নাফের চেষ্টার পরও রাজনীতি ছাড়েননি মমতাজ বেগম। স্বামীর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে। অবশেষে ১৯৫৯ সালের ১৫ নভেম্বর আব্দুল

মান্নাফের সঙ্গে মমতাজ বেগমের দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদ ঘটে।

ভাষা আন্দোলনে ১৯৫৫ সালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির আগের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীনিবাসগুলোর ছাদে কালো পতাকা উড়িয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। রাতেই আর্মি বেআইনিভাবে ছাত্রদের আবাসিক হল ও ছাত্রীনিবাসে ঢুকে জোরপূর্বক পতাকাগুলো নামিয়ে ফেলে। ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও পরদিন ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়।

২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ছাত্রীরা শাড়ি পরে খালি পায়ে এসে আমতলায় হাজির হন। ভাষার দাবির স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী লায়লা নূর (পরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রথম নারী অধ্যাপক হন) বলেন, ক্যাম্পাসের উপর পাকিস্তান পুলিশ ও আর্মির কঠোর নজরদারি ছিল। রাতে ছাত্রীরা হোস্টেলের ছাদে বড়ো বড়ো কালো পতাকা টানিয়ে দেয়। ক্যাম্পাসে আর্মি ঢোকার অনুমতি না থাকলেও তারা জোরপূর্বক মেয়েদের হোস্টেলে ঢুকে এবং পতাকাগুলো নামিয়ে ফেলে। পরদিন সকালে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা থেকে মিটিং-মিছিল শুরু করলাম। আমাদের সাথে প্রায় ১৫০ জনের মতো ছাত্র ছিল। তখন এক ট্রাক আর্মি দ্রুত এসে পড়ে। ছাত্রদের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ শুরু করে। প্রচণ্ড লাঠিচার্জের মধ্যে সেখানে মেয়েদের অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমি আর হোসনে আরা লাইব্রেরির বারান্দায় চলে আসি। কারণ মিটিং-এ দাঁড়ানোর মতো অবস্থা সেখানে আর ছিল না। আর্মিও লাইব্রেরির বারান্দায় আসে। আর্মি আমার হাতে যখন হ্যান্ডকাপ লাগাতে আসে, আমি ক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে ধমক দিয়ে বলি– আমাকে ছোঁবে না বলছি। কোথায় যেতে হবে বলো। আর্মি ছেলেগুলো আমার ধমক শুনে অবাক হয়। কিছুটা সময় নেয়। তারপর আমাদেরকে ট্রাকে উঠতে বলে। সকাল ১১/১২টায় আমাদেরকে বারান্দা থেকেই গ্রেফতার করে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তবে আমার আর হোসনে আরার হাতে হ্যান্ডকাপ পরাতে পারেনি। ঐদিন ২০/২১ জন ছাত্রী গ্রেফতার হয়। জেলখানায় রাতে আমাদের একটা ফ্লোরে শুতে দেয়। ফ্লোরটিতে আগে থেকেই বিভিন্ন মামলার নারী আসামিরা থাকত। ছাত্রীদের যারা গ্রেফতার থেকে বেঁচে যায়, তারা রাতে হোস্টেল থেকে আমাদের জন্য বিছানা পাঠিয়ে দেয়।

'৫৫-র ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনা সম্পর্কে ভাষা সৈনিক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, এবার শহিদ দিবসে এত ছাত্রী গ্রেফতার হয়েছিল যে, তাদের জন্য লালবাগ কেল্লার তদানীন্তন পুলিশ সদর দপ্তরে তাঁবু খাটিয়ে অস্থায়ী জেলখানা স্থাপিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। পার্থক্য শুধু এই যে, এবারে গুলি চলেনি। '৫৫ সালের আন্দোলনই পাকিস্তান সরকারের ৯২ (ক) ধারা শাসনের চূড়ান্ত ফাটল ধরায়। সরকার বুঝতে পারে, বাংলা ভাষার অধিকার আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ২১ জন ছাত্রী গ্রেফতার হলেও তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রীদেরকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার কোনো চেষ্টা করেনি। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ড. জেন কিন্স। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক। এ প্রসঙ্গে লায়লা নূর বলেন, ড. জেন কিন্স ছিলেন কড়া লোক। দেখতে খুব ফর্সা ও লম্বা। বৃটিশরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাই তিনি ছাত্রীদের দ্বারা ১৪৪ ধারা ভাঙা পছন্দ করেননি। এ কারণে তিনি ছাত্রীদের ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করেননি। আমার বড়ো বোন উম্মে কুলসুম গুল নাহার নূর ঐ সময় ফরিদপুর থাকত। সে ফরিদপুর স্কুলের হেড মিস্ট্রেস ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রে সেই ছিল আমার অভিভাবক। আমি ১৪৪ ধারা ভাঙার দায়ে জেলে আছি–এই খবর জানিয়ে ভিসি আমার বোনকে চিঠি দেয়। ২১ দিন পর মার্চের ১২ বা ১৩ তারিখে আমাদেরকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে দেয়। জেল থেকে বেরিয়ে আমি চামেলী হাউজেই (বর্তমান এস এম হল) উঠি। জেল জীবন এবং মুক্তি পাওয়া নিয়ে ভাষা সৈনিক প্রতিভা মুৎসুদ্দির স্মৃতিচারণ– ... খবরের কাগজ পেতাম কোন কোন পাতা কাটা। কেবল বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। আমাদের সঙ্গে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ফরিদা বারী মালিক (বীথিদি, মালিক সাহেবের ভাইঝি), অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী তালেয়া (বাবা সরকারি সিনিয়র অফিসার), পদার্থবিদ্যা বিভাগের ফরিদা (বাবা সরকারি অফিসার), ইংরেজি বিভাগের হোসনে আরা আপা ও একই বিভাগের কুমিল্লার লায়লা নূর আপা, ইসলামের ইতিহাসের কামরুন নাহার লাইলী এবং আমি প্রতিভা মুৎসুদ্দি (অর্থনীতি বিভাগ)। প্রায় সবার অভিভাবক সরকারি কর্মকর্তা। প্রাণের দাবী, মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলনে নেমে ছিলাম অভিভাবকের কথা না ভেবেই। মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ডের বোনদের পরিচয় জানা হয়নি। সবার একমাত্র পরিচয়– আমরা বাংলা ভাষার দাবির আন্দোলনের সহযোদ্ধা। চাকরির ভয়ে অভিভাবকরা দিন কয়েকের মধ্যে এসে তাদের মেয়েদের নিয়ে গেলেন। আমার বাবা থাকেন চট্টগ্রামে। আর কামরুন নাহার লাইলীর অভিভাবক বরিশালে থাকে। প্রায় সপ্তাহ দুই পর আমার ডাক পড়লো। অফিসে গিয়ে দেখি আমার বাবা এসেছেন। তিনি জেলারকে আগে থেকেই চিনতেন। জেলারের সামনেই আমাকে কয়েকটি চড়-থাপ্পড় দিলেন বাবা। বললেন, পড়াশোনা বাদ দিয়ে আন্দোলন করা হচ্ছে? জেলার বললেন, মারধোর না করে মেয়েকে নিয়ে যান। দেখে রাখবেন।'

১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রীদের গ্রেফতারের ঘটনায় সমালোচনার ঝড় ওঠে সারাদেশে। পাকিস্তান সরকার বুঝতে বাধ্য হয়, ভাষার দাবির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে তাদের আপোষ করতেই হবে। প্রয়াত ভাষা সৈনিক গাজিউল হকও ঐ সময় জেলে ছিলেন। ছাত্রীদের জেল জীবনের তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শীও। স্মৃতিচারণে তিনি বলেন, 'আমি এই কথা স্পষ্টভাবেই বলতে চাই যে, ১৯৫৫ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই ৯২(ক) ধারা শাসনের অবসান ঘটে। ... পাকিস্তান সরকারের মনে এ ধারণা দৃঢ়ভাবে জন্মেছিল যে ভাষার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি লোকই আপোশহীন।' সুতরাং তাদের সাথে বসতে হলে প্রাথমিক শর্ত হবে– ভাষার দাবি স্বীকার করে নেয়া। ফলে, ১৯৫৬ সালে যে সংবিধান রচিত হল সে সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হলো। সফল হলো শহিদের রক্ত দেওয়া, সফল হলো বাংলা ভাষার সংগ্রাম।'

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ এবং ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত চলা আন্দোলনের ফল আসে ১৯৫৬ সালে। সে বছরের ২৯ ফেব্রুয়ারি সংবিধানে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সরকার। গৃহীত সংবিধানের ২১৪ অনুচ্ছেদের শুরুতেই লেখা হয় ২১৪- (১) The State languages of Pakistan shall be Urdu and Bengali... । বাংলা ভাষার এই সাংবিধানিক অর্জনে নারীদের অনবদ্য ভূমিকা এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। পঞ্চাশের দশকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি সমাজে নারীদের রাজপথে নামা সহজ ছিল না। তাই বাঙালি নারীর অগ্রগতির বড়ো ধাপ ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার ঘটনা। মহান একুশের কারাবরণকারীসহ সকল নারী ভাষা সৈনিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বের সাহসী অংশীদার, জাতীয় বীর।

লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

বাংলা একাডেমি ও একুশে বইমেলা

ইলিয়াছ হোসেন পাভেল

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ মাতৃভাষার জন্য বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক আত্মোৎসর্গ স্মরণে এ মাসে বাংলা একাডেমি আয়োজিত বইমেলার নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা', যা একুশে বইমেলা হিসেবে পরিচিত। বাঙালির প্রাণের উৎসব এ মেলা স্বাধীন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলোর অন্যতম। প্রতিবছর এ মেলা বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণ ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে চলে এ মেলা। যে প্রিয় প্রাঙ্গণে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়, সে বাংলা একাডেমি এবার ৬২ বছরে পা দিয়েছে।

বাংলা একাডেমি ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সে হিসাবে ২০১৫ সালের ৩ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির ৬০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি এবার ৬২ বছরে পা রেখেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও প্রচারের লক্ষ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) এই একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন-পরবর্তী কালের প্রেক্ষাপটে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। 'বর্ধমান হাউজ'-এ এই একাডেমির সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। একাডেমির 'বর্ধমান হাউজে' একটি 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর' আছে। কালে কালে এটি পরিণত হয়েছে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাষা তথা যাবতীয় বিদ্যাচর্চার তীর্থকেন্দ্রে। বর্ধমান হাউজে স্থাপিত হয়েছে 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ', 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর' এবং 'জাতীয় লেখক ও সাহিত্য জাদুঘর'। পাশেই নবনির্মিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভবনের ৮ তলা বিশিষ্ট ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে মূল কার্যালয়। এই কার্যালয়ের নিচ তলায় রয়েছে অত্যাধুনিক সুযোগ সংবলিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তন এবং কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষ।

বর্ধমান হাউজ

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক বশীর আল হেলালের মতে, বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সংগঠনের চিন্তা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রথম করেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ভাষা সংক্রান্ত একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবি করেন। এছাড়া *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা বাংলা একাডেমি গঠনে জনমত সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। ১৯৫২ সালের ২৯ এপ্রিল পত্রিকাটি 'বাংলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে সময় কিছু প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৫৪ সালে এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অর্থাভাবে প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন হয়নি। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, 'যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউজের বদলে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউজকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে।'

অবশেষে ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার উদ্‌বোধন করেন 'বাংলা একাডেমি'র। বাংলা একাডেমির প্রথম সচিব মুহম্মদ বরকতুল্লাহ। তার পদবি ছিল 'স্পেশাল অফিসার'। ১৯৫৬ সালে একাডেমির প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন অধ্যাপক মুহম্মদ এনামুল হক। বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশিত বই আহমদ শরীফ সম্পাদিত, দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত *লাইলী মজনু*। ২০০৯-২০১১ খ্রিষ্টাব্দে একাডেমির 'বর্ধমান হাউজ' ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় ভাষা আন্দোলন জাদুঘর স্থাপন করা হয়।

বাংলা একাডেমির প্রথম বড়ো কাজ ছিল 'পূর্ব পাকিস্তানি ভাষার আদর্শ অভিধান' প্রণয়ন। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* এবং ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* প্রকাশিত হয়। বাংলা অভিধান চর্চার ধারায় এ দুটি গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সর্বস্বীকৃত। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রতিটি অভিধানই বাংলাভাষী মানুষের কাছে পেয়েছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা। এছাড়া অধ্যাপক গোলাম মুরশিদের সম্পাদনায় তিন খণ্ডে বেরিয়েছে *বাংলা ভাষার বিবর্তন অভিধান*। সহযোগী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকার। বাংলা ভাষায় এ রকম অভিধান এই প্রথম।

প্রমিত বাংলা বানানরীতি প্রণয়ন বাংলা একাডেমির একটি বড়ো কাজ। এর পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নও বাংলা একাডেমির সাম্প্রতিক বড়ো কীর্তি। দুই বাংলার খ্যাতিমান দুই ভাষাবিদ রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকারের তত্ত্বাবধানে দুই খণ্ডে প্রণীত হয়েছে বাংলা একাডেমির এই বাংলা ব্যাকরণ। এতদিন ব্যাকরণ নামে যা চলে আসছে তা আসলে সংস্কৃত ব্যাকরণেরই বাংলা রূপ। এই প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রণীত হলো। এই ব্যাকরণ রচনায় দুই সম্পাদক ছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহবুবুল হক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকারের অবদান ব্যাপক।

বাংলা একাডেমি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। একাডেমির কার্যনির্বাহী প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন মহাপরিচালক। এর প্রথম মহাপরিচালক ছিলেন প্রফেসর মযহারুল ইসলাম। যিনি ২ জুন ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বাংলা একাডেমির বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ৪টি বিভাগ রয়েছে। এই বিভাগগুলো হচ্ছে: ক) গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ খ) ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ গ) পাঠ্যপুস্তক বিভাগ ও ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ।

বাংলা একাডেমি থেকে জানুয়ারি ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ৪৯৬৫টি পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এতে রয়েছে কথাসাহিত্য, কবিতা, সাধারণ

অভিধান, পরিভাষা অভিধান, বিভিন্ন লেখক-কবির রচনাবলি, সাহিত্য গবেষণা, সাহিত্য সমালোচনা, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা, ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, শিশু-কিশোর সাহিত্য, অনুবাদ, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনী ইত্যাদি বিষয়ের গ্রন্থাবলি।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলা একাডেমি বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ করে আসছে। ১৯৫৭'র জানুয়ারি মাসে *বাংলা একাডেমি পত্রিকার* প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। *বাংলা একডেমি পত্রিকা* একটি গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমি প্রথম প্রকাশ করে *উত্তরাধিকার* নামক একটি সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। পরবর্তী দশ বছর পত্রিকাটি মাসিক পত্রিকা হিসেবে চালু থাকলেও ১৯৮৩ সাল থেকে ত্রৈমাসিকে রূপান্তরিত হয় এবং পত্রিকাটি ধীরে ধীরে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ২০০৯ সালের জুলাই থেকে মাসিক হিসেবে এটি প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ২০০৯ সালের আগস্ট থেকে বাংলা একাডেমির ত্রৈমাসিক মুখপত্র *বাংলা একাডেমি বার্তা* নামে প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া *বাংলা একডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা* একটি ষান্মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা এবং *ধানশালিকের দেশ* একটি কিশোর ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

আজকের বাংলা একাডেমি বই মেলার জন্য দেশ-বিদেশে সুপরিচিত হলেও বই মেলার শুরুটা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে বটতলায় এক টুকরো চটের ওপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। এই ৩২টি বই ছিল চিত্তরঞ্জন সাহা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমান মুক্তধারা প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা বই। এই বইগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রথম অবদান। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত তিনি একাই বইমেলা চালিয়ে যান। তাঁকে দেখে অনেকে অনুপ্রাণিত হন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক ড. আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমিকে মেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মেলার সাথে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি। এ সংস্থাটিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন সাহা। ১৯৮৩ সালে কাজী মনজুরে মওলা বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে বাংলা একাডেমিতে প্রথম 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র আয়োজন করেন। এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে শিক্ষা ভবনের সামনে ট্রাক তুলে দিলে দুজন ছাত্র নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেই বছর আর বইমেলা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে অমর একুশে বইমেলার গোড়াপত্তন হয়। সেই ৩২টি বইয়ের ক্ষুদ্র মেলা কালানুক্রমে বাঙালির সবচেয়ে স্বনামধন্য বইমেলায় পরিণত হয়েছে। বাংলা একাডেমি চত্বরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ২০১৪ সাল থেকে বইমেলা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ২৯৯টি অংশগ্রহণকারী প্রকাশকের মধ্যে ২৩২জনকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্টল বরাদ্দ করা হয়। ২০০২ সালে মেলায় ২৪০ জন এবং ২০১২ সালে সর্বোচ্চ ৪২৫ জন প্রকাশক অংশগ্রহণ করে।

বাংলা একাডেমির আয়োজনে মাসব্যাপী এ মেলা এবারও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও বাংলা একাডেমি চত্বরে দুভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবার অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে দোকান (স্টল) ও প্যাভিলিয়ন বরাদ্দে ডিজিটাল লটারি। এর মধ্যদিয়ে নির্ধারিত হয়েছে কোন প্রকাশনা সংস্থা কোথায় তাদের স্টল ও প্যাভিলিয়নটি পাচ্ছে। এবারের মেলায় ১ ইউনিটের স্টল পেয়েছে–১৪২টি প্রতিষ্ঠান, ২ ইউনিট পেয়েছে–১১৪টি, ৩ ইউনিট পেয়েছে–৩১টি ও ৪ ইউনিট পেয়েছে–১৯টি প্রতিষ্ঠান। আর প্যাভিলিয়ন পেয়েছে মোট ১১টি প্রকাশনা সংস্থা। এবারের মেলার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে খাবারের দোকানের পাশাপাশি আরেকটি নতুন স্টল সংযোজন হয়েছে। শিশুদের জন্য মাতৃদুগ্ধ পানের আলাদা একটি স্টল থাকছে। মেলায় অনেক মা তাদের শিশুদের নিয়ে আসেন যারা এখনও মাতৃদুগ্ধ পান করে। সেই সব শিশুদের কথা চিন্তা করেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিশু চত্বরের অংশে ব্রেস্টফিডিংয়ের জন্য আলাদা স্টল করে দেওয়া হয়।

বেশ কয়েক বছর পূর্বে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিন থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হতো। এরপর ক্রেতা, দর্শক ও বিক্রেতাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারির শেষ দিন অবধি এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু ফেব্রুয়ারি মাসে চার বছর পর পর অধিবর্ষ আসে, তাই কখনো এ মেলা মাসের ২৮ দিনে, কখনও ২৯ দিনে শেষ হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় মেলা আয়োজনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে। তবে মেলায় কোন কোন প্রকাশনা সংস্থার স্টল স্থান পাবে, কেমন স্টল করতে পারবে, তার জন্য বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে আলাদা কমিটি গঠিত হয়। ২০১০ সাল থেকে এ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কিছুটা কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। প্রকাশিত বইয়ের কপি জাতীয় আর্কাইভ ও জাতীয় গণগ্রন্থাগারে জমা দেওয়া হয়েছে কি না, কর নির্দেশক নম্বর (TIN) ঠিক আছে কি না যাচাই করার পাশাপাশি প্রকাশিত নতুন বইয়ের কপি বাংলা একাডেমির তথ্যকেন্দ্রে জমা দেওয়ার বিষয়টিও বাধ্যতামূলক করা হয়।

মেলার আয়োজন ও বিন্যাসেও এসেছে আধুনিকতা। প্রকাশনীসমূহের স্টলগুলো প্রকাশক এলাকা, প্রকাশক-বিক্রেতা এলাকা, শিশু কর্নার, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং লিটল ম্যাগাজিন ইত্যাদি জোনে বিভাজন করে স্থাপন করা হয়। এছাড়া মেলা চত্বরকে ভাষা শহিদ সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত, শফিউর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রমুখ ব্যক্তিত্বের নামে ভাগ করা হয়। এ মেলায় দেশের খ্যাতনামা সব প্রকাশনী, বই বিক্রেতা ছাড়াও ভারত, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে নানা প্রকাশনা সংস্থা তাদের বই ও প্রকাশনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে। এ মেলায় বাংলা একাডেমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ইত্যাদি সরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও অংশ নেয়। মেলাতে ইদানীং সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি বিভিন্ন ডিজিটাল প্রকাশনাও স্থান করে নিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মোবাইল ফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানও তাদের সেবার বিবরণসহ মেলায় উপস্থিত হয়। মেলাতে বেশ জনপ্রিয়তার সাথে স্থান করে নিয়েছে লিটল ম্যাগাজিন। মেলার মিডিয়া সেন্টারে থাকে ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স ব্যবহারের সুবিধা। এছাড়া রয়েছে লেখক কর্নার এবং তথ্যকেন্দ্র। মেলা প্রাঙ্গণ পলিথিন ও ধূমপানমুক্ত। এছাড়া মেলায় শিক্ষাসহায়ক পরিবেশ ও তথ্যের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ টাস্কফোর্স রাখা হচ্ছে, যারা বইয়ের কপিরাইট বা মেধাস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করেছে কি-না শনাক্ত করে ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিচ্ছে। মেলায় প্রবেশের জন্য ছুটির দিন ও কর্মদিবসে আলাদা প্রবেশ সময় রয়েছে, কিন্তু কোনো প্রবেশ ফি নেই।

মেলা চলাকালীন প্রতিদিনই বিভিন্ন আলোচনা সভা, কবিতা পাঠের আসর বসে। প্রতি সন্ধ্যায় থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলাতে লেখককুঞ্জ রয়েছে, যেখানে লেখকেরা উপস্থিত থাকেন এবং তাদের বইয়ের ব্যাপারে পাঠক ও দর্শকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়া মেলার তথ্যকেন্দ্র থেকে প্রতিনিয়ত নতুন মোড়ক উন্মোচিত বইগুলোর নাম, লেখক ও প্রকাশকের নাম ঘোষণা করা হয় ও দৈনিক প্রকাশিত বইয়ের সামগ্রিক তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন রেডিও ও টেলিভিশন চ্যানেল মেলার মিডিয়া স্পন্সর হয়। এসব চ্যানেল মেলার তাৎক্ষণিক খবরাখবর দর্শক-শ্রোতাদেরকে অবহিত করে। এছাড়াও মেলার প্রবেশদ্বারের পাশেই স্টল স্থাপন করে বিভিন্ন রক্ত সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠান। স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে রক্ত সংগ্রহ করে থাকে তারা।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার বাংলা ভাষার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য পুরস্কার। বই মেলার প্রবর্তক চিত্তরঞ্জন সাহার নামে ২০১০ সাল থেকে 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে প্রকাশিত বইয়ের গুণমান বিচারে সেরা বইয়ের জন্য প্রকাশককে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। মেলার স্টল ও অঙ্গসজ্জার জন্য দেওয়া হয় 'সরদার জয়েনউদদীন স্মৃতি পুরস্কার'। মেলায় সর্বাধিক গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য সেরা ক্রেতাকে দেওয়া হয় 'পলান সরকার পুরস্কার'। এছাড়াও বাংলা একাডেমি রবীন্দ্র পুরস্কার ও মোহাম্মদ নুরুল হক গ্রন্থ সুহৃদ পুরস্কার প্রদান করে থাকে।

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক

কেন্দ্রীয় শহিদমিনার

বাংলা ভাষা

অতীত ও বর্তমান

ম. মীজানুর রহমান

পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর তথা জীব-জন্তুর আপন আপন ভাষা আছে। জীবনযাপন ও প্রাণ রক্ষার তাগিদে প্রতিটি জীব নিজ নিজ ভাষায় পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড় করে রাখে। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি কেউই আপন ভাষা সম্পর্কে এমন বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। বিশ্বব্যাপী সর্বমোট কত ভাষাভাষী লোকের বসবাস তা আজও সঠিকভাবে নির্ণিত হয়নি। ভাষার পার্থক্য বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, এলাকা, স্থান ও গোত্র ভেদে বেশ লক্ষণীয়। জাতিতে জাতিতে ভাষার এ বিভিন্নতা বিশ্ব সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান ২০০০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি প্রথম 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌বোধনকালে বলেন, '...আজ সমগ্র মানবকুলের ভাষার মূল্যবোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সহনশীল চৈতন্যবোধ সর্বলোকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এই যুগে বিশ্বব্যাপী কেবল কতিপয় ভাষা জাগতিক ভাষারূপে বিদ্যমান কিন্তু আরো যেসব বহুমুখী ভাষা স্থানীয়ভাবে সক্রিয় রয়েছে তার মর্যাদাপূর্ণ স্থান দেওয়া এখন আমরা জরুরি মনে করি। জাতিসংঘ ও ইউনেস্কো বহুকাল ধরে কাজ করে আসছে মাতৃভাষার উন্নয়নকল্পে এবং ভাষা বৈচিত্র্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় শিক্ষাদান অব্যাহত রেখেছে। আশঙ্কা এই, আজ যে ছয় হাজার ভাষা কথ্য রয়েছে আগামী বিশ বছরের মধ্যে তা যাতে বিলুপ্ত না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত হবে মানবজাতির ঐতিহ্য, ঐসব সাধারণ ভাষাগুলো সংরক্ষণে দ্বিগুণ প্রয়াস অব্যাহত রাখা। সর্বোপরি আমাদের যুগের শিক্ষা হচ্ছে, পারস্পরিক ভাষাসমূহ ত্যাজ্য না করে অন্তর্গত মহিমায় মানবতার কল্যাণে একের অধিক ভাষা রপ্ত করে মানুষে মানুষে যোগাযোগ সৃষ্টি করে মানবজীবন সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা। সকল মানুষের সকল ভাষা সংরক্ষণ করেই একভাষা অন্য ভাষার সঙ্গে সহাবস্থান করুক এই নব শতকে।...'

মোটামুটি ২২টি মাতৃভাষা বিশ্বব্যাপী আপন আপন ঐতিহ্যে সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে জাজ্বল্যমান-

১. চীনা (১২৫ কোটি লোকের ভাষা), ২. ইংরেজি (৪৯.৭০), ৩. হিন্দি (৪৭.৬০), ৪.স্পেনিশ (৪০.৯০), ৫.রাশিয়া (২৭.৯০), ৬. আরবি (২৩.৫০), ৭. বাংলা (২০.৭০), ৮. পর্তুগিজ (১৮.৭০), ৯. ফরাসি (১২.৭০), ১০. জাপানি (১২.৬০), ১১. জার্মানি (১২.২৬), ১২. উর্দু (১০.৪০), ১৩.পাঞ্জাবি (৯.৪০), ১৪. কোরীয় (৭.৪০), ১৫. তেলেগু (৭.৫০), ১৬. তামিল (৭.৪০), ১৭. মারাঠি (৭.১০), ১৮. ভিয়েতনামিজ (৬.৮০), ১৯. জাভানিজ (৬.৪০), ২০.ইতালীয় (৬.২০), ২১.তুর্কি (৬.১০), ২২. তাগালোগ (৫.৭০); এতদ্ব্যতীত বিশ্বব্যাপী প্রায় ছয় হাজারের অধিক সংখ্যায় রয়েছে বিভিন্ন উপজাতীয় উপভাষা।

বাংলা আমার ভাষা। আমার সকল অনুভূতির অভিব্যক্তি নানাভাবে আকারে-প্রকারে প্রকাশিত হয় এই ভাষায়। এ যে আমার মাতৃভাষা। এ আমার হৃদয়ের অন্তর্গত আত্মানুভূতির স্পর্শে আপনাআপনিই বিগলিত হয়ে পৌঁছে যায় মরমে মরমে। ছোটোবেলা থেকেই জীবনের যাত্রাপথে আমরা বেড়ে উঠেছি মা-বাবার যত্নে লালনপালনে আর শিক্ষকের পরিচর্যায় শিক্ষাদীক্ষায়। বিশ্বের সকল সমাজের সকল শিশুই যে এমনিভাবে বেড়ে উঠছে তা নয়, যদিও সকল শিশুরই তা নায্য প্রাপ্য। ভাষা সুমিষ্ট ও সুন্দরভাবে বলতে হলে তা যথাযথভাবে জানতে হবে, শিখতে হবে। জানতে হবে এর ব্যাকরণ, বাক্য-বর্ণবিন্যাস এবং শুদ্ধ শব্দোচ্চারণ।

পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি শাসকদের মতদ্বৈততা, স্বায়ত্বশাসন ও অন্যান্য বিবিধ দ্বন্দ্বাত্মক কারণে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করে বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানের নামকরণ করে বাংলাদেশ। আর বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। তবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে মধ্যযুগেই বাঙলায় বা বঙ্গদেশে (অখণ্ড) বাংলা ভাষার উন্নয়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে থেকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা আজকের রূপে এসে দাঁড়িয়েছে।

ষোড়শ শতকের একজন মুসলমান কবি সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮) যিনি মধ্যযুগে বাংলা কবিতায় পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন, তার কতিপয় চরণ হলো-

আজ্রাইল মহামতি আইল বায়ুর গতি
রসূলের পুরীর দুয়ারে ॥
রসূলের নাম ধরি ডাকে কহে ভক্তি করি
আজ্ঞা মাগে যাইতে অন্তপুরে ॥...
(রসূলের অন্তিম শয্যা)

এখানে শব্দের অনাড়ম্বরতা লক্ষণীয়। 'ডাকে কহে' বাংলা চলিত ও সাধু ভাষার সংমিশ্রণ। সে যুগের ঐ কবির মতো আধুনিক যুগের কবিদের কবিতায় আমরা চলিত ও সাধু বাংলার সংমিশ্রণ দেখতে পাই। শুধু আঙ্গিকের, ভাবের বৈচিত্র্য ছাড়া ভাষার বাঙ্ময়তায় তা বোধ করি

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীম উদদীন, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখের কবিতায়ও দেখতে পাওয়া যায়। আর এর মধ্যে দেখা যায় মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের দূরতম আত্মীয়তার পরম স্নিগ্ধ সাযুজ্য।

ষোড়শ শতকে কতিপয় ইউরোপীয় খ্রিষ্টান মিশনারি (ধর্ম প্রচারক) বঙ্গদেশে আসতে শুরু করেন। অবশ্য তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার করা। তারা উপলব্ধি করে বাঙালিদের কাছে ধর্মমত ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হলে বঙ্গদেশের বাংলা ভাষাটি আয়ত্ব করা দরকার। শুধু তাই নয়, ধর্ম প্রচারে খবরের কাগজের গুরুত্ব অনুভব করে বাংলা ভাষার প্রিন্টিং প্রেস (মুদ্রণ যন্ত্র) স্থাপনে তারা উদ্যোগী হন এবং ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের গোয়ায় বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হয়।

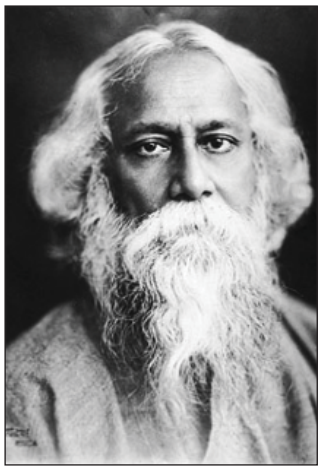

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

বাংলা ও ফারসি মুদ্রাক্ষরের আধুনিক উদ্ভাবক ছিলেন স্যার চার্লস উইলকিন্স (১৭৪৯-১৮৩৬)। প্রথম বাংলা মুদ্রিত বই এন. বি. *হ্যালহেডের এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ* (১৭৭৮, তাঁরই উদ্ভাবিত মুদ্রাক্ষরে ছাপা হয়। তিনি এর নকশা খোদাই, মুদ্রাক্ষর ঢালাই ও মুদ্রাকরের কাজ নিজেই করেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে এবং সপ্তম শতকের প্রারম্ভে আরো কতিপয় পর্তুগিজ মিশনারি বাংলাদেশে আসেন। এদের মধ্যে *ম্যানোয়েল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও* এবং *ডোম এ্যান্টোনিও* ১৭৪৩ সালে প্রথম রোমান হরফে বাংলা গদ্য ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সম্বাদ ও কৃপার অর্থভেদ এবং প্রথম রোমান হরফে মুদ্রিত বাংলা-পর্তুগীজ অভিধান সংকলন ভোকাবোলারিও এম ইডিওমা বেঙ্গলায়ে পর্তুগীজ প্রকাশ করেন। প্রথম বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষ (১৭৯৩) বাংলা-ইংরেজি হরফে সংকলন করেন অ্যান্থনি ডি সুজা।

কলকাতার অদূরে শ্রীরামপুর মিশন হতে ঢাকার ভাওয়াল অবধি এদের ছিল অবাধ গতিবিধি ও কর্মতৎপরতা। বাংলা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে এরাই ছিলেন পথিকৃৎ। রোমান হরফে ম্যানোয়েল যে মধ্যযুগীয় বিদঘুটে বাংলা ব্যাকরণগত ভাষার অবতারণা করেছিলেন, ১৯৪৩ সালে স্যার জি এ গিয়ার্সন ব্যাপক গবেষণা করে দেখতে পান তন্মধ্যে রয়েছে ঢাকা ও ফরিদপুরের আঞ্চলিক কথ্য বাংলা শব্দাবলি। ইতোপূর্বে ১৭৭৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির করণিক এন বি হ্যালহেডের ব্যাকরণ *এ গ্রামার অব বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ* এরপরে লেবেদেফ (১৮০১), রামমোহন রায় (১৮২৬) বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ফাদার উইলিয়াম কেরি(১৮২৭) ডি. ডি. জন ক্লার্ক মার্সম্যানের (১৭৯৪-১৮৭৭) সহায়তায় প্রকাশ করেন সহজবোধ্য বাংলা ব্যাকরণ এবং বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষ। পরে মার্সম্যান কেলীর ৮/১২ সাইজের অভিধানটিকে আরো সংক্ষেপ করে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে জন মেন্ডিস, উইলিয়াম মর্টন এবং স্যার গ্রেভস সি হটন প্রমুখের হাতে বাংলা শব্দকোষের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

এদেশে আগত ইংরেজ প্রশাসকদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষালাভের সুবিধার্থে তদানীন্তন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। শাসনকার্যের সুবিধার্থে তখন বাংলা ভাষা শিক্ষাটা ইংরেজদের কাছে খুবই জরুরি ছিল। ইংরেজরা এদেশের শাসক হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফারসি। বাংলা ভাষার মধ্যে তৎকালে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ যুক্ত হয়ে যায়। এসব বিদেশি শব্দগুলো পরিহার করে সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচলন করাটা যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন ইংরেজ শাসকগণ। এই কাজটি চলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। ১৮৪১ সালে ইশ্বরচন্দ্র এই কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) বাংলা ভাষার ব্যাকরণকে সংস্কৃত ভাষা থেকে জটিলতামুক্ত সরল করে *ব্যাকরণ কৌমুদি* প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছেন- '...যদি আমার উপর তাঁহাদের সন্দেহ থাকিত, তাহা হইলে, অনায়াসেই তাঁহারা চোর ধরিতে পারিতেন, একে, ওকে, তাকে, সন্দেহ করিয়া বেড়াইতেন না। কারণ, যদিও আমি, ঐ সময়ে, খুব সতর্ক হয়ে কথা কই; কিন্তু মধ্যে মধ্যে, বিলক্ষণ অসামাল হয়ে পড়ে; অর্থাৎ হঠাৎ এমন সব কথা, আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে যে, আমি উপযুক্ত ভাইপো বলিয়া, অক্লেশে বুঝিতে পারা যায়। ভাগ্যক্রমে আমি এ পর্যন্ত ধরা পড়ি নাই, এবং শীঘ্র ধরা পড়িব, তাহাও সম্ভববোধ হইতেছে না। লোকে জানে আমার চালাকি ও ফচকিয়ামি আইসে না; কিন্তু, আমার পুস্তকে ঐ দুয়ের ভাগই অধিক; সুতরাং আমি ঐ অপূর্ব গ্রন্থের রচয়িতা, লোকের এরূপ সংস্কার হওয়া সম্ভব নহে। বস্তুতঃ আমি চালাক ও ফচকিয়া নই। কিন্তু মা সরস্বতীর আমার উপর এমনই দয়া যে, লিখিতে বসিলে, অদ্বিতীয় অতি দুর্দান্ত মহাবল, পরাক্রান্ত কলম বাহাদুরের প্রফুল্ল মুখপদ্ম হইতে ফচকিয়ামি মধু ভিন্ন, অন্য কোন রস, বড় একটা, নির্গত হয় না।... (আবার অতি অল্প হইল)'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত *বেতাল পঞ্চবিংশতি* হচ্ছে সরল সাধু বাংলায় লেখা প্রথম বই। প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩) -এর *আলালের ঘরের দুলাল* বাংলা সাহিত্যের প্রথম কথ্যগদ্যে লেখা বই। এরপর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), যিনি বিদ্যাসাগরের বাংলা রীতি-পদ্ধতি অনুসরণে সাধু বাংলা বাক্যরীতি সংযুক্ত সংস্কৃত অলংকার প্রয়োগ করে হৃদয়গ্রাহী বাংলা গদ্য প্রণয়ন করেন।

৩

অন্যদিকে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) সুদূর নেপালে গিয়ে নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে কিছুকাল পড়াশুনা করেছিলেন। সেখানে তিনি বিপুল বৌদ্ধ দোঁহা ও গান সংগ্রহ করলেন এবং তৎসঙ্গে আবিষ্কার করলেন হাজার বছরের বাংলা চর্যাপদ। ঢাকার বাংলা একাডেমি থেকে বহুবিধ বাংলা আঞ্চলিক শব্দ সম্ভারে অভিধান প্রণয়নে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ও ড. এনামুল হকের হাড়ভাঙা পরিশ্রমলব্ধ বিপুল অবদান অনস্বীকার্য।

এফ.ই. পারগিটার (১৮৮৬), ডব্লিউ সাটন্ পেজ, জন বিয়ামস এবং হোমলা এর মতো বেশ কিছু প্রাচ্যবিদ একাডেমিশিয়ান বাংলাদেশের আঞ্চলিক কথ্যবাংলা, বাংলার আদি ব্যাকরণ প্রভৃতির গবেষণায় যথেষ্ট বুৎপত্তি দেখিয়েছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের স্থানিক্ কথ্য শব্দাবলি সংগ্রহ ও সংকলন তাঁদের গবেষণার অন্তর্গত ছিল। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রাজ্ঞ পণ্ডিত-গবেষক ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম বাঙালি ব্যক্তিত্ব যিনি বাংলা ভাষা সমস্যার বিষয়টি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বাংলা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাচনধ্বনি তত্ত্বসহ শব্দতত্ত্ব বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন তাঁর *শব্দতত্ত্ব* এবং *বাংলা ভাষা পরিচয়* গ্রন্থে।

আরেকজন খ্যাতিমান বাঙালি কবি হচ্ছেন শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) যিনি এগারো বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার পরীক্ষক ছিলেন, তিনি বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দ প্রকরণ সম্বলিত সরল সহজ ভাষায় লিখেছিলেন *শিশুরজ্ঞান বর্ণশিক্ষা'* এবং প্রাথমিক ও উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের জন্য *প্রাথমিক রচনা শিক্ষা*, *সাহিত্য শিক্ষা* ও *মক্তবের বাংলা শিক্ষা* যেগুলি তাঁর কালে অবিভক্ত বাংলায় অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল বাংলা ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায়। উনবিংশ শতকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক উন্মেষ ঘটে। তাছাড়া এ সময় থেকেই বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের অবাধ আগমন এবং তার অনুবাদ হওয়ার ফলে বাঙালি সমাজে তার প্রভাব অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রযুক্তিগত আঙ্গিকে একরকম সাযুজ্য ঘটাতে থাকে ঠিক তখন থেকেই।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম বৈপ্লবিক রূপান্তর আনলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। যিনি ইংরেজি, গ্রীক, ল্যাতিন ও ইতালীয় ভাষা আয়ত্ব করে বিবেকের তাড়নায় উপলব্ধি করলেন ইংরেজি নয়, মাতৃভাষা বাংলাই তাঁর প্রতিভা বিকাশের আসল ক্ষেত্র। মধুসূদন সম্পর্কে তৎকালীন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জন ইলিয়ট ড্রিন্‌ক ওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৬২) বলেছিলেন, 'তিনি (মধুসূদন) তাঁর প্রতিভা নিজ অভিজ্ঞা-অভিরুচি অনুযায়ী যদি স্বদেশি ভাষায় নিবদ্ধ রাখেন তাহলে তিনি অধিকতর স্বদেশের সেবা দিতে সক্ষম হবেন।'

বেথুনের উপদেশই যেন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল মধুসূদনের জীবনে। মধুসূদন ইতালির বিখ্যাত মহাকবি দান্তে (১২৬৫-১৩২১) আর ইংল্যান্ডের বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬)-এর সনেট অনুসরণ করে বাংলা কবিতায় প্রথম সনেট ও মুক্ত ছন্দ প্রবর্তন করলেন। ভারতীয় মহা-পুরাণ অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় প্রথম মুক্তাক্ষরে রচিত তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য *মেঘনাদ বধ কাব্য (১৮৬১)* গ্রিসের মহাকবি হোমারের (খ্রি. পূর্ব ৮৪০) *ইলিয়ড*-এর আদলে চরিত্র-চিত্রণ আর এবং কবি জন মিল্টনের (১৬০৮-১৬৭৪) *প্যারাডাইস লষ্ট*র রীতিতে কাব্য নির্মাণ এ মহাকাব্যকে বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল। এভাবেই তাঁর হাত দিয়েই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কাব্যসাহিত্যে এলো আধুনিকতা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

পরবর্তীকালে বাঙালি কবিরা মুক্ত ছন্দেই কবিতা ও সনেট লিখে চলেছেন। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্যতিক্রম নন। বাংলার নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য ঢং-এর কবিতাগুলিই মুক্ত ছন্দের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে *সং অফারিংস্* কবিতায় তিনি নোবেল বিজয়ী হন তা মূলতঃ তাঁর ইংরেজি গদ্য কবিতাগুচ্ছের সমাহার মাত্র। তাছাড়া অধিকাংশ আধুনিক কবি মুক্ত ছন্দে শুধু কবিতাই লেখেন না, কবিতাতে প্রতীকী আনতে যথেচ্ছ পৌরাণিক শব্দও ব্যবহার করে থাকেন। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যেও ক্ষণপ্রভা কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রতীকীরূপে হিন্দু পুরাণ থেকে দেব-দেবী সম্বলিত অনেক শব্দ এবং পবিত্র কোরানের আরবি শব্দ আহরণ করে তাঁর *বিদ্রোহী, সাম্যবাদী* ও অন্যান্য কবিতায় চমকপ্রদভাবে প্রয়োগ করে যশস্বী হয়েছেন। এতদ্ব্যতীত বহু ফারসি শব্দ বাংলা সাহিত্যে সংযোজন করে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে করেছেন সমৃদ্ধ।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

আবহমানকাল ধরে এইভাবে কাব্য-সাহিত্য চর্চা চলে আসছে আর তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু কবি সাহিত্যিকের অশেষ মেধা ও শ্রম। সুখের বিষয় বাংলাদেশ এই সুশীল সুকুমার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা থেকে আদৌ পিছিয়ে নেই। কালের কলধ্বনির তালে তালে চলার গতি এগিয়ে যাচ্ছে বড়ো দ্রুত।

৪

এ দেশের অসীম সাহসী সন্তানেরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে অকাতরে আপন মিষ্টি ভাষা বাংলাকে মহা সম্মানে রাষ্ট্রভাষায় উন্নীত করতে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা আন্দোলনের পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে বিগত অর্ধ শতাব্দীকাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অসাধারণ অগ্রগণ্য অভিযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি হওয়ার ফলে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের বাঙালিদের বাংলা ভাষায় স্বভাবতঃই হিন্দি বাকরীতির সংমিশ্রণ এসেছে। এখানেই বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের বাংলা ভাষারীতির বা বাকরীতির দুস্তর ফারাক সৃষ্টি হয়েছে। প্রমিত বাংলা বানান, প্রবচন, বাচনপদ্ধতি, উচ্চারণ প্রভৃতি বাংলাদেশের বাংলা একাডেমির পণ্ডিত শিক্ষাবিদগণ সুচারুরূপে নির্ণয় করে দিয়েছেন। সেগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে যথাযথভাবে বাংলা বলতে, পড়তে ও লিখতে পারা সম্ভব।

এখন প্রতি বছরে আমরা ২১ ফেব্রুয়ারি 'শহিদ দিবস' অতীব শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করে থাকি। সেই সঙ্গে দিবসটি জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বব্যাপী ২০০০ সাল থেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবেও উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সেই ভাষার সম্মান বজায় রাখার তাগিদ প্রতিটি বাঙালি হৃদয়ে সুগ্রন্থিত হোক এটাই হবে শহিদ দিবসের পবিত্র শপথ আর তাহলেই বীর শহিদদের আত্মা পাবে পরম তৃপ্তি। আমরা সেইসব ভাষা শহিদদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভরে আজ স্মরণ করি। আর তাঁদের শ্রদ্ধার্থে কেন আমরা শুদ্ধভাবে বাংলায় কথা বলব না, কেন আমরা অযাচিত বাংলা শব্দগুলি বর্জন করব না যাতে চির উন্নত থাকে আমাদের ভাষা?

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় আঞ্চলিক বাংলা কথ্য ভাষা রয়েছে তার বিকৃতি তো আর রাতারাতি সরিয়ে ব্যাকরণগত বাংলা বাকরীতি অনুসারে শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা বলা এবং ঐসব বাংলা ডায়ালেক্টগুলো পালটানো আদৌ সম্ভব নয়। তবে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানসন্ততিদের শৈশব থেকেই শুদ্ধ করে বাংলা শিক্ষা দিতে পারি। এর মানে এই নয় যে আমরা পশ্চিম বঙ্গের বাংলা বাকরীতি অনুকরণ করব। আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাস-ঐতিহ্য ধারায় বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের যে অকৃত্রিম প্রীতি রয়েছে তাকে চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে সচেষ্ট হব।

লেখক : সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

নিবন্ধ

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ

আ. শ. ম. বাবর আলী

আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের লক্ষ্য শুধু ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মূলত তা ছিল আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক প্রকাশ। ১৯৫২ সালে এর চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটলেও আন্দোলনের শুরু অনেক আগেই। ভাষা মানুষের সামগ্রিক চেতনা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। একমাত্র মাধ্যমও বলা যেতে পারে। তাই মাতৃভাষার অপমান যে-কোনো জাতির কাছে চরম গ্লানিকর। ব্যক্তি, তথা গোটা জাতির উন্নতি একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব।

এদেশের জনগণ যেদিন থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করেছিল, সেদিন থেকেই তারা উপলব্ধি করেছিল, নিজেদের মুখের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে সামাজিক হোক, রাজনৈতিক হোক, আর্থিক হোক–কোনো স্বাধীনতা অর্জনই তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

দেশ বিভাগের আগেই ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বড়োলাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন যখন ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন, তখনই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠল এদেশের সচেতন নাগরিকরা। তাদের দাবি মোটেই গুরুত্বহীন ছিল না। একথা বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারল স্বার্থান্বেষী তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ। তারা শঙ্কিত হলো। নব্য স্বাধীন দেশের অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, বাঙালিদের ন্যায্য আধিপত্যকে মেনে নিয়ে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারা এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী, অর্থাৎ বাঙালিদের বিজয়। তাই

নবপ্রতিষ্ঠিত দেশের শাসনভার হাতে নিয়েই বাঙালীদের রাষ্ট্রভাষার দাবিকে নস্যাৎ করে দেওয়ার সার্বিক দায়িত্ব তারা গ্রহণ করল।

বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবির প্রতিরোধকারীদের পক্ষে কোনো যুক্তি ছিল না। নবপ্রতিষ্ঠিত গোটা পাকিস্তানের সর্বমোট জনসংখ্যা ছিল ৮ কোটির মতো। তারমধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটি। প্রধানত ৬টি ভাষা ছিল তৎকালীন গোটা পাকিস্তানে। এরমধ্যে 'বাংলা' মাতৃভাষা ছিল শতকরা ৫৬ জনের। যে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তৎকালীন শাসকচক্র কোমর বেঁধে লেগেছিল, তা মাত্র ৭ শতাংশ নাগরিকের মাতৃভাষা ছিল শতকরা ৫৬ জনের ভাষাকে বাদ দিয়ে মাত্র ৭ জনের ভাষার উন্নয়ন কিছুতেই রাষ্ট্রীয় কল্যাণের সহায়ক হতে পারে না। একথা যে তৎকালীন শাসক চক্র জানত না, তা নয়। কিন্তু ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কল্যাণের চেয়ে জাতীয় কল্যাণকে বড়ো করে দেখার মানসিকতাকে তারা কোনোদিনই গ্রহণ করেনি।

বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করার কারণ হিসেবে তারা বলল, এ ভাষা বিজাতীয় ভাষা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যাদের সামান্যতম জ্ঞান আছে, তারা জানেন কথাটা কত অযৌক্তিক। তাছাড়া সৌকর্যের দিক দিয়ে বাংলা ভাষা অনেক বেশি সমৃদ্ধ, অন্তত উর্দুর চেয়ে তো বটেই।

ইংরেজদের শাসনামলে দীর্ঘ দুশ বছর ধরে অফিস-আদালত সর্বক্ষেত্রে কার্য পরিচালনার একমাত্র মাধ্যম ছিলো ইংরেজি। তখন উপমহাদেশের সব ভাষাই উপেক্ষিত ছিল। এসব ভাষার চর্চাও একরকম বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষা তাদের কাছে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়াল। এদেশীয় ভাষায় একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির চেয়ে স্বল্প ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি পেতে থাকল অধিকতর সুযোগ-সুবিধা। এদেশীয় ভাষায় উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজি না জানা ব্যক্তি হয়ে পড়ল একজন নিরক্ষরের চেয়েও গুরুত্বহীন। রাষ্ট্র এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ল। একইবারে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হওয়ার অর্থ ব্যবসাবাণিজ্য, চাকরিবাকরি, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে বাঙালি পশ্চাৎগামিতা। এদেশের জনগণ তা ভালোভাবেই বুঝল।

১৯৪৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের কর্ণধার জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় এসে রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এবং কার্জন হলের ছাত্র সমাবেশে যখন উর্দুকে 'পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বলে ঘোষণা করলেন, তখন বিক্ষোভে ফেটে পড়ল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজসহ গোটা সচেতন নাগরিক মহল। উত্তাল তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল একটি সফেদ সমুদ্র।

সে গর্জন চলতে থাকল। কিন্তু তা সহজ অথবা সাবলীল পথে নয়, অনেক প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। অনেক রক্ত ঝরিয়ে। সে সমুদ্রের তরঙ্গ একদিন আছড়ে পড়ল বেলাভূমিতে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। সে তরঙ্গের কিছু অংশ ভেঙে চূর্ণ হলো ঠিকই, কিন্তু বেলাভূমিও ধসে পড়লো সমুদ্রের অতলে। পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হলো পাকিস্তানের কুচক্রী শাসকগোষ্ঠী। শপথ সুদীপ্ত হলে কোনো বাধাই দুর্ভেদ্য হতে পারে না, বাঙালিরা তা আরো একবার প্রমাণ করল। অবশেষে চক্রান্তকারীদের জাল থেকে মুক্ত হয়ে বাংলা ভাষা তার প্রাপ্য মর্যাদা পেল। জয় হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের। আর সে জাতীয়তাবাদের সূত্র ধরে ধীরে ধীরে সজীব হয়ে উঠতে থাকল স্বাধিকারের সোচ্চার সচেতনতা, যার সর্বশেষ বা চূড়ান্ত ফললাভ হলো একাত্তরের স্বাধীনতা।

তাই চেতনার নিরিখে বিচার করলে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে–একুশের আন্দোলন, যার সূত্রপাত হয়েছিল অনেক আগে থেকেই, তা শুধু ভাষার পরিসীমাতে আবদ্ধ ছিল না। তা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের সরব প্রকাশ। যার পূর্ণতা এসে দাঁড়াল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টিতে।

লেখক : কবি ও সাহিত্যিক

লুকোচুরি

নাসিম সুলতানা

সোহানী কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। রুমমেট মায়া তাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করে, আর সে একটি কাজ দিয়েছে, এখন কি করে মায়াকে না বলবে? কাজটা অনেক কঠিন। মায়া একজনের সাথে দীর্ঘদিন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। এমন সময় মায়ার সাথে আর একজন ধনকুবের ছেলের পরিচয়। জানি না ওর এ পরিচয় কতদূর গেছে। বড়ো লোকের পুত্ররা বন্ধুত্ব করে স্বার্থের জন্য। স্বার্থ শেষ বন্ধুত্বও শেষ। সোহানী এ ব্যাপারে মায়াকে অনেক আগেই সাবধান করেছিল। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে মায়ার দু'চারটা কথা ও ওর চালচলন সোহানীর ভালো লাগতো না। রুমমেট থাকার কারণে ওর খারাপ দোষগুলো ওভার লুক করেই ওকে বান্ধবী হিসেবেই মেনে নিয়েছিল।

সোহনীর বাবা মধ্যবিত্ত সংসারের। আর তিনটি সন্তানের খরচ যোগাতে সোহানীকে ঠিকমতো টাকা পয়সা দিতে পারতো না। সোহানী টিউশনি করে বেশিরভাগ লেখাপড়ার খরচ যোগাতো। যখন টান পড়তো তখন মায়া তাকে ঋণ হিসেবে অর্থ দিয়ে সাহায্য করত।

আর মায়া আদরের দুলালী বিরাট ব্যবসায়ীর মেয়ে। রংপুরে তাদের বাড়ি। বাবার একমাত্র সন্তান হিসেবে তার দাপট অনেক বেশি। মেয়ে যা বলবে বাবা-মা তাতেই সায় দিবে। এ যেন এক

স্বাধীনচেতা হরিণ। একবার এখানে ছুট তো একটু পর আর এক জায়গায়। সকালে এক ড্রেস তো বিকেলে আরেক ড্রেস কিনতে ছুটল।

তার এ চলাফেরার জন্য সোহানী তাকে অনেক সাবধান করেছে। ও বলেছে মায়া, এভাবে চলাফেরা করিস কেন? সব কিছুর একটা সীমা আছে। দেখ, তুইও এক জেলা থেকে পড়তে এসেছিস আমিও আর এক জেলা থেকে। এখানে আমাদের বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্বের খাতিরে বলছি- বন্ধু লাগাম দাও, তা না হলে পস্তাতে হবে।

মায়া ওকে জড়িয়ে ধরে বলে-দোস্ত, তুই না আমার মায়ের মতো কথা বলিস। তাই তো তোকে আমি খুব ভালোবাসি। কিন্তু দোস্ত আমি তোমাকে যা বললাম তা তোমাকে করতেই হবে। আর সেটা হলো তোমার বাড়ি তো চিটাগাং, তো কোনো সমস্যা নাই। এই দু'দিন পর তিনদিনের দিন ঈদ করতে বাড়ি যাবে। আর এই ঠিকানায় নাঈমের সাথে দেখা করবে। মোবাইল নম্বরটা সেভ করে নাও। তুমি যেন মায়া। ও যা বলবে তাই শুনবা। কোনো বাড়তি কথা বলবা না। ও খুব ভালো ছেলেরে! এতদিন ঢাকায় এসেছে কিন্তু আমার সাথে দেখা করার জন্য জিদ করেনি। ও সব সময় বলত আমাদের দেখাটা হবে একটি সারপ্রাইজ।

সোহানী এতক্ষণ হা করে মায়ার কথা শুনছিল, আর ভাবছিল কি সাংঘাতিক মেয়ে মায়া। একজনের সাথে প্রেম করতে করতে যাকে জীবন সঙ্গী হিসেবে কথা দিয়েছে তা না করে আর একজনকে নিয়ে খেলা। আর এর কারণ নাকি নতুন প্রেমিকের ঢাকায় গাড়ি–বাড়ি বিত্ত সবই আছে। মায়া একেবারে কাদায় পড়ে যাবে। ওর আফসোসের সীমা থাকবে না। যাকে ভালো বলছে তার পিছনে না ঘুরে যাকে চিনে না, জানে না তার পিছনে দৌড়ানো?

সোহানী কোনো কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললো। কারণ তারা এত উচ্ছৃঙ্খলভাবে বড়ো হয়নি। মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা,বিশ্বাস, মনোবল,সৎসাহস বাবা মা'র কাছেই শিখেছিল। মানুষকে ঠকালে নিজেকে ঠকতে হয়। এ শিক্ষাও গ্রহণ করেছে।

কিন্তু মায়ার ধ্যান-ধারণা এমন কেন? সে কি করে সোহানীর বন্ধু হলো? এ কথা ভাবতে ভাবতে তার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু চকচক করে উঠল। আবার সে কোনো বিপদে পড়বে না তো? এমন সময় মায়ার ডাকে সম্বিৎ ফিরে আসলো।

মায়া তাকে ধাক্কা দিয়ে বললো- কিরে সোহানী এতো কি চিন্তা করছিস। আরে তুই তো তোর দেশেই ঈদ করতে যাবি। বাবা-মা, ভাইবোনের সাথে দেখা করবি এবং আমার বন্ধুর সাথে দেখা করে প্রক্সি দিবি। এইটুকু পারবি না? এতে এত চিন্তা তকে দিয়ে কিছু হবে না। তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই ঐ লোকটাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিস। এত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তোকে। আরে আয় আয়- আমার বুকে আয়। কোনো চিন্তা নাই দোস্ত, ও অনেক ভালো ছেলে।

সোহানী চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বলে-না, আমি চেষ্টা করব। কিন্তু তুই তার সাথে কীভাবে কথা বলতিস, আর আমি কীভাবে কথা বলব- সে যদি বুঝে ফেলে পুলিশে দিবে না তো?

মায়া হা হা করে হাসতে থাকে। ও সোহানীকে আবার জড়িয়ে ধরে। আরে তুই কথা কম বলবি, বুঝলি। বোবার ভূমিকা,এবার বুঝলি। সোহানী আর কি করবে। কয়েকদিন পর বাড়ি যাওয়ার জন্য গোছ-গাছ শুরু করে দিল। মায়াকে জিজ্ঞেস করল তুই বাড়ি যাবি না। মায়া বলল তার নতুন বন্ধু এজাজ নাকি তাকে বাড়ি যেতে নিষেধ করেছে। সোহনী আবার বলল, তোমার ওর সাথে এভাবে মেলা মেশা করা ঠিক না, তুমি ফাঁদে পড়বে। মায়া হেসে বলল আরে না না। আমাকে কে ঠকাবে বল? আমি অনেক চালাক। সোহানী বলল–অতি চালাকের গলায় দড়ি পড়ে। তুই সবসময় বর্তমান নিয়ে চিন্তা করিস। ভবিষ্যৎ টাও তো ভাবতে হবে।

এভাবে নির্দিষ্ট দিন সোহানী দুরু দুরু চিত্তে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল। মায়াই তাকে ষ্টেশনে এগিয়ে দিল। নাঈম চিটাগাং-এর ছেলে। চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স শেষ করে একটি ঔষধ কোম্পানিতে চাকরি করে। বাবা-মা শহর থেকে একটু ভিতরে থাকে। এ কারণে অফিসের কোয়ার্টারে তাকে একা থাকতে হয়। অবশ্য মাঝে মধ্যে তার বাবা-মা এখানেও থাকে। এ সবই সে মায়ার কাছে শুনেছে।

মোবাইলে ক্রস কানেকশনে দু'জনের সাথে পরিচয়। এ পরিচয়ই পরবর্তীতে প্রেমে রূপ নেয়। কিন্তু মজার ব্যাপার কেউ কাউকে সামনা সামনি দেখেনি। এই একটা গোপন খেলা তাদের দু'জনকে সব সময় কৌতূহলে রাখত। ও বলত তুমি কেমন দেখতে? অপর জনও একই কথা বলত। এই আধুনিক যুগে কেউ কাউকে দেখেনি। কি এক আশ্চর্য খেলা। এই খেলা কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে।

ট্রেনের ঝিকির মিকির শব্দে সোহানীর ঘুম ভেঙে যায়। সে দেখে অনেক দূর চলে এসেছে। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই সে খণ্ড খণ্ড মেঘগুলো ভেসে যেতে দেখে। তার মনের কোণেও এমন মেঘ জমা হয়ে আছে। কি এক অদ্ভুত কাজে সে জড়ালো। ঢাকায় সে যখন পড়তে এসেছিল- তখন তার বাবা-মা তাকে বলেছিল মা, কখনো কোন ছেলে মেয়ের সাথে অতিরিক্ত মিশো না। নিজের কাজ করবা আর ভাল পথে চলবা। কারও জিনিসে লোভ করবা না।

সে তো মা-বাবার উপদেশ মতোই চলছিল। তবে কেন সে মায়ার জালে আটকালো। মায়াকে সে বলে দিত- এ জঘন্য কাজ সে করতে পারবে না। একজনের প্রক্সি আরেকজন দিতে পারে না কি? যে ছেলের সাথে জীবনে কথা বলেনি। আর তার সাথে প্রেমের অভিনয়! এসব ভাবতে ভাবতে সোহনীর শরীরটা কেমন যেন শীত শীত করে ওঠে। সে ভাবে আবার জ্বর টর আসবে না তো।

ধীরে ধীরে স্টেশনে এসে পৌঁছালো ট্রেন। তারপর একটা সিএনজি নিয়ে সোজা বাড়ি। হঠাৎ সোহানীকে দেখে বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই অবাক। একটা টেলিফোন নাই, হঠাৎ চমক, মা তো খুব খুশি। সোহানী বলল- বলে আসলে তো এত খুশি না।

রাতের দিকে নাঈমের ফোন আসলো। কি ব্যাপার মায়া- কখন এসেছো, ফোন করো নাই কেন, কেমন আছো তুমি? এতগুলো প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিবে সোহানী। ভয়ে সে কাশতে থাকল। নাঈম বলে উঠল কি ব্যাপার তোমার কি ঠান্ডা লেগেছে? থাক তুমি আজকে রেস্ট নাও। কাল বিকেলে রোদেলা রেস্টুরেন্টে বড়ো ছাতাটার নিচে অপেক্ষা করব, নীল রঙের শাড়ি পড়ে তুমি আসবে। তা হলে অতি সহজেই আমি চিনে ফেলব। সোহানী কোনো কথা বলছে না দেখে নাঈম বলল, থাক থাক তোমাকে কিছু বলতে হবে না। কাল বিকেলে আমাদের দেখা হচ্ছে।

সোহানী ঘামতে থাকে। সে জীবনে এমন পরিস্থিতিতে পড়ে নি। রাতে অবশ্য মায়ার সাথে কথা হয়। মায়া তাকে ঘাবড়াতে না করে। রাতে সোহানীর ভালো ঘুম হলো না । তার মা কিন্তু সোহনীর অন্যমনস্কতা খেয়াল করল। তিনি বললেন মা, তোর কি শরীর খারাপ না কি । কেমন যেন চুপচাপ। সোহনী হেসে বলল না মা, ও কিছু না। মা কাল বিকেলে আমি প্রিয়াদের বাড়ি যাব, তোমার না একটা নীল শাড়ি আছে, দাও না,ওটা পড়ে যাব। মা শাড়িটা এনে বললেন, নে এটা তুই পরিস। আমার এত পাতলা শাড়ি ভালো লাগে না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে সুন্দর করে শাড়িটা পড়ল। বেশি সাজাগোজ করল

না। কারণ তাকে পছন্দ করার ব্যাপার তো এটা না। একটা রিকসা নিয়ে সে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল। রিকসা থেকে সে দেখলো- একটা লম্বা মতো ছেলে হোন্ডায় বসে উলটো দিকে মুখ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। মায়ার বর্ণনা অনুযায়ী সোহানীর বুঝতে বাকি থাকল না যে, এই নাঈম। সোহানী রিকসা ভাড়া দিয়ে সারে নি- এর মধ্যে নাঈম উঠে এসে বলল-হ্যালো মায়া। নিশ্চয়ই তুমি মায়া। আরে নামো নামো..।

সোহানী নামতেই হোন্ডাটা সামনে এনে তার উপর তাকে এমনভাবে বসতে বলল যে, সে কিছু বলার সুযোগই পেল না। যেনো যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো তাকে বসতে হলো। সাঁ করে বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর একটা বাড়ির সামনে হোন্ডা থামলো। সোহানী এ কাজের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এমন সময় একজন মা'র বয়সি মহিলা এসে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল। সেখানে নাঈমের বাবাও ছিল। তার দু'জনে সোহানীর জন্যই বসে ছিল।

এদিকে সোহানী ঘামতে ঘামতে শেষ। নাঈমের মা বলল- নাঈম ফ্যানটা ঘুড়িয়ে দে। কুশলাদি বিনিময়ের পর নাঈমের বাবা সোহানীকে জিজ্ঞেস করলো তোমার বাবা'র নাম কি? সোহানী বাবা'র নাম বললো-এরফান চৌধুরী। চিটাগাং 'ল' কলেজের প্রফেসর।

নাঈমের বাবা চমকে বললো আরে তুমি এরফান চৌধুরীর মেয়ে? তিনি তো আমার অনেক পরিচিত। আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি থাকলো না। নাঈমের বাবা বললো–চল আমরা কালকেই ওদের বাসায় যাই।

কোথায় মায়া, কোথায় সোহানী কেউ বুঝতে পারলো না-এ লুকোচুরি। সোহানী শুধু ছটফট করতে থাকল-কখন সে বলবে, যে সে বিয়ে করবে না। যখনই কিছু বলতে যাচ্ছে তখনই অন্য একটা কথা বলে স্টপ হয়ে যাচ্ছে। সন্ধার সময় সে বাসায় চলে আসলো।

পরদিন নাঈমরা আসবে। কি করে, সোহানী না করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে বাবার রুমে গেল। না, সাহস করে বলতেই হবে। সেখানে বাবা-মা দু'জনকে দেখে সোহানী বাবার কাছে গিয়ে বসে। সোহানী কোন ভনিতা না করে বলে-বাবা আমার সাথে একটা ছেলের পরিচয় হয়েছে। তার বাবা বাঁশখালী রহমতউল্লাহ কলেজের প্রফেসর ইমতিয়াজ চৌধুরী, তার কথা শেষ না হতেই- বাবা উচ্ছ্বাসিত হয়ে বললেন আরে বলিস কি? ইমতিয়াজের সাথে কতদিন দেখা নাই। আমরা একসাথে অনেকদিন শিক্ষকতা করেছিলাম।

আর যাই কোথায়? সোহানী কোন কিছু লুকানোর জায়গা পেলো না। এ যেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হওয়ার মতো। সন্ধায় ওরা স্বদলবলে এসে সোহানীকে আংটি পরিয়ে দিল। তার কোনো কথাই কেউ শুনলো না।

দু'দিন পর নাঈমের সঙ্গে সোহানীর বিয়ে হয়ে গেল। অনেক সংকোচ, অনেক লজ্জায়, অনেক অপরাধীর মতো সোহানীর নতুন জীবন শুরু হলো। নাঈমের মতো একটা ভালো ছেলে তার জীবনসঙ্গী হবে- এটা সোহানী কল্পনাও করেনি। কিন্তু মায়ার ফোন বন্ধ কেন? মায়ার কিছু হলো না তো? সে তো ফোন বন্ধ রাখে না। সোহানীর অনার্স পরীক্ষা শেষ। মায়ারও, কিন্তু মায়া তো বাড়ি যায় নি। তবে কেন ফোন করে না। সে কোনো বিপদে পড়ল না তো? মায়ার জন্য তার অনেক চিন্তা হয়।

হঠাৎ ঐদিন দুপুর বেলা একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে। সোহানী রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে মায়ার কণ্ঠ। সোহানী বলে- মায়া, মায়া তোর ফোন এত দিন বন্ধ ছিল ক্যান? মায়া, সব ওলট পালট হয়ে গেছে রে, তোর কথা আমি রাখতে পারি নি! সে আমাকে মায়া ভেবে বিয়ে করে ফেলে। তুই আমাকে শাস্তি দে। যে শাস্তি দিবি তাই আমি মাথা পেতে নিব।

মায়া ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল- আমি সব শুনেছি তোর ছোট বোনের কাছে। তুই আমাকে অনেক ফোন করেছিস-তাও শুনেছি। আমার শাস্তি আমি পেয়ে গেছি, তোকে দিতে হবে না। জানিস, ধনকুবের ছেলেটা একটা ফ্রড। সে আমার ইজ্জত লুটতে চেয়েছিল। আমি অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। ওরা কাউকে ভালোবাসে না। ভালোবাসার অভিনয় করে। তুই আমার একটা ভালো বন্ধু। তোর কথা খুব মনে হয়। আমি দোয়া করি তোরা সুখী হো।

এপাশ থেকে সোহানীর কান্না থামে না। মায়া বলে, না সোহানী আর কান্না না। হয় তো তোর কথা না শুনে ভুলই করেছিলাম। যাক বন্ধু তুমি সুখী থাকো। আবার দেখা হবে। এই বলে ফোনের লাইন কেটে দিল।

ফিরে আয় বাবা

জাফরুল আহসান

মেধা ও মননে তুই ছিলি সেরা সরল যুবক
ভ্রষ্ট সময়ে তোকে নিয়ে গেল নষ্ট কুহক
বিশ্বাসে তুই পান করে নিলি তরল গরল
দাহ্য নয় জানি তবু গরল জ্বালল অনল।

জীবনে সুধা, গন্ধ, বৈচিত্র্য, রূপ-রস সবই
দিয়েছি তোকে, একে নিবি তুই জীবনের ছবি
তোকে তো আমরা দিইনি কখনো এমন শিক্ষা
তবু বেছে নিলি রক্ত, মৃত্যু, হত্যা, দীক্ষা?

ঝলকানি দেওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের ভাষা তোর নয়
চাপাতি-ভোজালি-থ্রি নট থ্রি-ওরা তোর নয়
ধর্মের নামে হত্যা ও খুন তাও তোর নয়
তবুও মিথ্যা ভুলের বেসাতি ছেড়ে দিতে ভয়?

আদরের ধন পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ভুলে
পঙ্কিল পথে ! কেমনে ফেরাব কোন সে মাশুলে
বিপরীত স্রোতে গোলকধাঁধায় পথেই হারাবে?
বৈরী সময়ে বুকের পাঁজরে রাখব কীভাবে!

সুহৃদ-স্বজন, ফুল-পাখি-নদী সবকিছু ছেড়ে
কোথায় পালালি! জলে ভেজা চোখে তোকে খুঁজে ফেরে
ফেরাতে পারেনি মায়ের আকুতি, স্নেহ-চুম্বন
তুই যে ফেরারি, ছুড়ে ফেলে গেলি সব বন্ধন।

পিতৃঋণের কাছে, ফিরে আয় বাবা ফিরে আয় তুই
মা'র স্নেহের আঁচল বিছানো পথে তোরে ছুঁই
ফিরে আয় বাছা, সোনার দেশের সোনামণি তুই
ভুলের মাশুল দিতে হয় দেব, ফিরে আয় তুই।

বায়ান্নর ফাগুন

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

বেদনার ভারে নুয়ে পড়ছে কৃষ্ণচূড়ার ডালগুলো
বিসর্জিত পাপড়িগুলো দ্রোহের ক্রন্দনে শ্বাসরুদ্ধ।

শিমুল-পলাশ-মহানন্দার ডালে বসে শহিদেরা বলছে
সেদিনও ঘরের আঙিনায় বাহারি ফুলের বাগান দেখেছি
নদীর জল ছিল ফাগুনি জোছনার মতো টলমলে
প্রতিটি গ্রাম ছিল সবুজ স্বর্গ-শান্তির নীড়।

তোমাদের যন্ত্রদানবের নিশ্বাসের বিষে বৃক্ষশূন্য গ্রামগুলো
একটি শিমুলবৃক্ষ বেড়ে উঠলেই কুঠারাঘাতে নির্মূল কর
একটি পলাশ পেতে পাড়ি দিতে হয়- তেপান্তরের পথ।

মহানন্দার ডাল দিয়ে কিশোরীকে দোররা পেটা করছ
ডাল কেটে কেটে ডেকে এনেছ ওদের অকাল মৃত্যু
ক'বছর পরে আমরা বসব কোথা-বলতে পার?

অথচ বায়ান্ন'র ফাগুনে নিষ্ঠুর পুলিশের গুলিবিদ্ধ হয়ে
দেশজুড়ে শিমুল-পলাশ-মহানন্দার সর্বোচ্চ শিখরে উঠে
গলা ফাটিয়ে বলেছিলাম– 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

মায়ের ভাষা

নাছিমা বেগম

মধুর আমার মায়ের ভাষা
সবার মনে সুখের আশা,
ছোট্ট শিশুর আধফোটা বোল
সবার মনে খুশির রোল,
পাখপাখালির গানের সুরে
দুঃখ ব্যথা যায় যে দূরে।

মায়ের ভাষায় কথা বলা সবার অধিকার
এই ভাষাকে কেড়ে নেবে সাধ্য আছে কার?
চাপিয়ে দেয়া উর্দু ভাষা নয়তো মায়ের ভাষা
বঙ্গবন্ধু গর্জে ওঠে, বলব মায়ের ভাষা।

নারী-পুরুষ সবাই মিলে ভাষার দাবীতে
প্রতিবাদের তুফান তোলে নামে রাজপথে।
পাকশাসকের পেটুয়া পুলিশ চালায় গুলি নির্বিচারে
ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ রক্ত ঝরে ভাষার তরে।

মায়ের ভাষা সবার উপর, রাখতে ভাষার মান
বীর বাঙালি বীরের জাতি, করল জীবন দান।
ভাষার জন্য এমন ত্যাগ, এমন আন্দোলন
বিশ্বজুড়ে সবার মাঝে জাগায় আলোড়ন।

বীর বাঙালি আবার জাগে, রফিক, সালাম যায় এগিয়ে-
ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ মাতৃভাষা দিবস নিয়ে
ইউনেস্কোতে দাবী তোলে, সব মানুষের সায় মেলে
রক্তে ভেজা একুশ এখন মায়ের ভাষার কথা বলে।

মানুষ আমরা এক পৃথিবীর ভাষা ভিন্ন ভিন্ন
মায়ের ভাষায় কথা বলার সুখ যে অভিন্ন।
ভাষার জন্য জীবন দিতে ক'জন বল পারে?
ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নজির বাঙালিরাই গড়ে।

বিশ্বজুড়ে একটি দিবস মায়ের ভাষার দিন
ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ অনন্য সে দিন
আমরা সবাই গর্বিত আজ, শোধে রক্ত ঋণ।
বাঙালির এই আত্মদান রবে অমলিন।

লাল-সবুজের দেশ

রাবেয়া সুলতানা

আমার বাবার মতো বাবা অনেক ছিল
মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা শহিদ হয়ে গেল
বিজয় আসে সনে-সনে, গুণে-গুণে রাখি
আমার বাবা মুক্তিসেনা জলে ভেজা আঁখি
এদিন তারে ভুলতে নারে দেশের জন্য তিনি
দিয়ে গেলেন অনেক কিছু তাঁহার মুখে শুনি
হায়না-শকুন এই দেশেতে কত ভং ধরে
লাল-সবুজের দেশে বসে ষড়যন্ত্র করে
বাংলাদেশের মানুষগুলো অনেক সরল ভাই
যুদ্ধ হলেই হায়নাদেরে মেরে সব সাফাই
বিজয় দিনে শহিদ গণে দোয়া করি সবে
হাজার বছর বেঁচে থাকুক ধন্য হয়ে ভবে।

বাংলা এবং বাংলাদেশের সীমা

বাতেন বাহার

আমার এ দেশ গিরি-নদী-বন, সবুজ সোনালি মাঠ
হাজার সাধক পীরের মাজার পূণ্য স্নানের ঘাট।
শত যুগ ধরে পাশাপাশি আছে মন্দির-মসজিদ
বৌদ্ধ বিহার-গীর্জার পাশে অজর প্রেমের গীত।
ধর্মের নামে নেই হানাহানি বিশ্বাসে ভরা প্রেম
সম্প্রীতি ভরা মার বুকখানি বন্ধু রহিম-শ্যাম।
মুসলিম যায় খ্রিষ্টান পাড়া, বৌদ্ধ বিহারে হিন্দু
ভালোবাসা আর সেরা সম্প্রীতি মিলে মিশে ভাব সিন্ধু।

নবীন কিশোর স্বাধীনতা প্রিয়, স্বর্গের ন্যায় মাতা
হৃদয়ে অমর একুশের বাণী, বিজয়ের সুর গাথা।
বুকের ভেতর ভাষার মিনার-মিনারে ভাষার মান
স্বদেশের মতো দশ দিশি জুড়ে বাংলার জয় গান।
সকলের মনে ভাষার শপথ, স্বাধীনতা সুখ খাসা
গরিয়সী মার অবারিত মুখ নন্দিত ভালোবাসা।
পাখির জীবন শাশ্বত মহান, বাঙালি জাতি সেরা
ভেঙেছে আজ মনের দেয়াল-মানে না তারের বেড়া।

পাখিদের মতো উড়ে যেথা, যারা আজ বাংলার দূত
গরবিনী মার সুখে-দুখে তারা অজেয় সাহসী পুত।
তাইতো 'আমার সোনার বাংলা' দিকে দিকে সুমধুর
বাংলা ভাষার আসর এখন দূর থেকে বহুদূর।
দূর থেকে দূরে 'অমর কবি'র বিজয় নিশান ওড়ে
বাংলা ভাষার ঘোর কাটে রোজ 'অগ্নিবীণা'র সুরে।
তাই নজরুল-রবি ঠাকুরের গান যেথা মধুরিমা
ততটুকু আজ বাংলা এবং বাংলাদেশের সীমা।

উষ্ণতার সান্নিধ্যে

জাকির আবু জাফর

উষ্ণতার সান্নিধ্যে জাগ্রত জীবনের সমস্ত উৎসব
মাতৃত্বের প্রবল আকাঙ্ক্ষাও এক ঘনিষ্ঠ উষ্ণতায় উৎসারিত
হাতের রেখায় যেভাবে বয়ে যায় উষ্ণতার নদী
তাকে স্পর্শ করার আনন্দে উদ্‌বোধিত প্রেমের পৃথিবী
প্রেমের শরীর ভরা তারই জয়গান
তারই উন্মাদনার অনন্য আয়োজন

কখনো কখনো উন্মত্ত অভিমান হয় অনিবার্য
আত্মা থেকে বেজে ওঠে হৃদয়বীণা
হৃদয়কে ঘিরে রাখে উষ্ণতার চাদর

জীবন মানেই উষ্ণস্রোতের মুখরিত বহমানতা
এক উদ্দীপিত চাঞ্চল্যের কম্পন বন্ধনের এক বিস্ময়কর বাঁশি
যা বেজে যায় হৃদয় থেকে হৃদয়ের পথে

বুকের উষ্ণতা জীবনকে জাগিয়ে তোলে পাখির নীড়ে
যেভাবে জেগে সমুদ্রময় জোয়ারের ঢেউ

উষ্ণতা থেকেই অঙ্কুরিত পৃথিবীর
সমস্ত প্রাণের জন্মলগ্ন উষ্ণতার জলে সিক্ত
মাতৃস্তনের উষ্ণ শরাবে আন্দোলিত শিশুর শরীর
তেমনি স্পন্দিত উষ্ণতা থেকেই উন্মুক্ত পৃথিবীর মুখ
উষ্ণতার সান্নিধ্য বিনে চাঁদও চাঁদ হয়ে ওঠে না
কলঙ্ক ছাপিয়ে সে হয়ে ওঠে প্রেমিকার মুখ
কি আশ্চর্য কোমল দানে ভেজায় পৃথিবীর হৃদয়

রাত্রির হৃদয় থেকে ঝরে পড়া শিশিরগুলো রোদের প্রেমেই শুকিয়ে ওঠে
রৌদ্রশোভিত দিনের উষ্ণতার খেলা যদি স্তিমিত হয়ে যায়
আঁধারের নৃশংসতা পৃথিবীকে পাথর করে তুলবে
সমস্ত ভাষা মুছে যাবে জগতের বুক থেকে
উষ্ণতা বুকে নিয়েই ভাষাবন্ত পৃথিবী

জগতের সমস্ত উৎসবই আন্দোলিত উষ্ণতার বাতাসে।

স্বপ্নযুগল চাঁদ

জাকির হোসেন চৌধুরী

মনভোজনের রঙিন তারে কুমারপাড়ার গান
জোছনা জ্বরে পুড়ছে নারীর মৌন যুগল চাঁন
মানকুমারি শূন্যে ওড়ায় লাজুকলতার ফুল
চোখের ভাষায় প্রীতির আগুন দীর্ঘ অভিমান।

অভিমানের ফুল ঝরে যায় কূলে কালির দাগ
নদীর পাড়ের মতো ভাঙে চাঁদের অনুরাগ
পদ্মা নদীর খাঁ খাঁ বুকে ইলিশ যেন গুম
বনভোজনে হৃদয় ছোবল বসায় বিষের চুম।

নাগ-নাগিনীর ইতিকথায় ছিল প্রেমের পাঠ
মুখর ছিল রমনা ঘাসে জোনাক বাতির হাট
তারায় তারায় আকাশ ছিল ঘোমটা খোলা হ্রদ
সে সব এখন উদাসপুরের জীর্ণ স্মৃতির মাঠ।

স্বরলিপি ভোলা গানে ভাঙা বাঁশি আজ
আপন ঘরে একলা এ মন, করছে পরের কাজ
মনের খোঁজে মন ছুঁয়ে যায় হারায় মনের পথ
ক্ষয়ে পড়ে স্বপ্ন যুগল চাঁদের কারুকাজ।

বাংলা ভাষা

ফরিদ আহমেদ হৃদয়

আমার ভাষা বাংলা ভাষা
সকল ভাষার শীর্ষে
এই ভাষাটা ছড়িয়ে আছে
এখন সারা বিশ্বে ।
আমার ভাষা বাংলা ভাষা
রক্ত দামে কেনা
তাইতো দেখি এই ভাষাটা
বিশ্ববাসীর চেনা ।
আমার ভাষা বাংলা ভাষা
পেয়ে আমি ধন্য
মনে প্রাণে করছি আমি
এই ভাষাটা গণ্য।

নতুন ইশতেহার

মিলি হক

আমার বক্তব্য দীর্ঘ নয় খুব সংক্ষিপ্ত
আমি সেই সন্তানের কথা বলব
যারা বুকের রক্তে বাংলা ভাষা দিয়ে গেছে
সেই সব যুবকের আর মানুষের কথা বলব
যারা একটা স্বাধীন ভূখণ্ড, লাল-সবুজ
পতাকা দিয়ে গেছে।

আমি সেই আয়লানের কথা বলব
সমুদ্রের জলে ভেসে এসে বালুতটে ঘুমিয়ে পড়েছে
পেট্রোল বোমায় দগ্ধ বাবার কথা বলব
ব্যান্ডেজে বাধা হাত তুলে সন্তানকে আদর করতে পারছে না।

বস্তাবন্দি দেহের খণ্ড খণ্ড টুকরা নিয়ে
ক্রন্দনরত মায়ের কথা বলব
বঙ্গবন্ধু, নেলসন ম্যান্ডেলা, মাদার তেরেসা
কোনির কথা বলব

চাই মানবাধিকার, চাই গণতন্ত্র, চাই শান্তি
সর্বোপরি দেশ মাতৃকা
বুদ্ধিদীপ্ত বিবেক সম্পন্ন মানুষ চাই
পোশাককর্মী সম্ভ্রমহারা নারীর কথা বলব
বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে আসা
সেই সাহসী শিশু কন্যাটির কথা বলব
বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয় সেই সব কথাও বলব
আমার বক্তব্য দীর্ঘ নয় খুব সংক্ষিপ্ত।

প্রশ্নের যবনিকা

নাহার আহমেদ

এলোমেলো চিন্তারা ঘিরে ধরল
মৌমাছির মতোন,
বাকরুদ্ধ আমি।
অন্তরে পুষে রাখা অভিমানী ঝড়ের
তাণ্ডবতার বহিঃপ্রকাশ কপালের ভাজগুলোকে
আরো প্রকটভাবে ফুটিয়ে তোলে।
কেশর ফুলিয়ে সিংহ যেন চেয়ে আছে।
চোখ জোড়ায় ঝরছে আগুন।
সেতারের দ্রুত লয়ের ঝালার চেয়েও দ্রুতগতিতে
চলছে শ্বাসপ্রশ্বাস।
সত্যের মুখোমুখি আজ হতেই হবে,
কেন এই কানামাছি খেলা।
সম্মুখে দণ্ডায়মান আগামী।
যোজন যোজন পথ মাড়িয়ে, মেঘের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে
অভ্যুদয়ের আলো চমকে দিল সত্যিটাকে।
অক্টোপাসের মতোন জড়িয়ে ধরে রেখেছে
রাক্ষসী রাজরোগ।
কেমোথেরাপি চলছে। অকপটে জানিয়ে দিলাম।
স্তব্ধতা। যন্ত্রণার অনুরণন
ক্ষমাসুন্দর নান্দনিক দৃষ্টি, ক্ষণিক যেন
ভালোবাসার নতুন পরশ বুলিয়ে দিল।
চাওয়া-পাওয়ার প্রদীপখানা এখনো জ্বলছে।
তাকে কি করে নিভাই।
দু'হাত বাড়িয়ে যেন নতুন করে
আলিঙ্গন করল, অপ্রিয় সত্যিটাকে।
হৃদয় আকাশে তখন অঝোর ধারায়
সান্ত্বনার নিরর্থক শ্রাবণধারা।
'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে'
পড়ুক ঝরে...।

নীরব দানের পুণ্যি

মনসুর জোয়ারদার

মাটি দিয়ে লেপা ছনে ঢাকা কুঁড়েঘরে
বসবাস করে মা'র সাথে পথকলি
রাত বেশি হলে টেনে নেয় দেহে তারা
ছেঁড়াফাটা কাঁথা পুরোনো চটের থলি,
শিরশির করা ঝড়ো দখিনা বাতাসে
কেটে যায় রাত গাঢ় ঘুমের আবেশে।

আচমকা ভোরে ঘুম ভাঙে দু'জনের
খোকার শরীরে তাকিয়ে কাঁদেন মাতা
চারদিক থেকে রাক্ষসী মশারা এসে
কামড়িয়ে গেছে গলা, মুখ, ন্যাড়া মাথা,
মাঝে মাঝে খোকা হাত বুলায় জ্বালাতে
মন মানে নাতো স্নেহ আর সান্ত্বনাতে।

বাসাবাড়ির কাজে জননীকে যেতে হবে
কাগজ কুড়াতে ছেলেটি নামবে পথে
বাঁচার তাগিদে কোনো অবসর নেই
সীমিত আয়ের কিছুই জমে না হাতে,
নিত্য অনটনে কাটে জীবন যাদের
আয়েসী ভাবনা বিড়ম্বনা যে তাদের!

বালকের মনে পাক খায় যে কথাটি
বলি বলি করে বলা হয় নাতো মাকে
শুধালেন শেষে 'বল বাছা কী বলবি'
খুশি হয়ে ছেলে আবেগে জানাতে থাকে
'ঈদের পরবে ভালো রাঁধবে এবার'
চুপ করে মাতা শুনলেন আবদার!

জবাব না পেয়ে পথে নেমে এসে ছেলে
অভিমানী চোখে নীল আকাশে তাকায়
খুঁজবে না ভাবে রমজানে প্রিয় চাঁদ
হিজল গাছের উঁচু ডালের মাথা,
অন্ন নাই যেথা শখের বাসনা মিছে
কাপড় কেনার সাধ্য কি মা'র আছে?

বিচিত্র ভুবনে কোথা দিয়ে কী যে হয়
খোকার কপালে তাই বুঝিবা ঘটল
এক দাতা ডেকে জামা দিয়ে গেল সবে
নতুন পোশাকে ছেলে অপূর্ব হাসল,
প্রাণভরে দেখে ভাবলেন মাতা তাই
নীরব দানের আসলেই জুড়ি নাই!

আমার রক্তমাখা ২১

কনক চৌধুরী

ভোরের সীমান্তের দিকে তাকিয়ে আছি
আলো ফোটার সময় বুঝি হয়!
মাতৃভাষার ফাঁসির ঘোষণা আমি কোনোদিন মেনে নিতে পারি না
পারি না চোখের সামনে আমার ৪৯টি অক্ষরের এমন মৃত্যু
প্রয়োজনে আমিই জীবন দিব ফাঁসির মঞ্চে।

না না না, এ ঘোষণার সাথে কোনো আপোশ নেই
ওরে কে কে রক্ত দেবার অপেক্ষায়
আয় চলে
এ রক্তমূল্যে টগর-বকুল-কামিনী-কৃষ্ণচূড়া আবার স্বনামেই ফুটবে
বাংলাতেই দেবে শিস দোয়েল, শ্যামা
বউ কথা কও, চোখ গেল, ওরাও ডেকে যাবে বাংলায়
আমিও হাসব বাংলায়, কাঁদব বাংলায়।

ফেব্রুয়ারি ২১
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ।
'মানি না, মানবো না
আমার মা, আমার ভাষা, আ-মরি বাংলা ভাষা!'

হঠাৎ গুলির শব্দ
গুলিবিদ্ধ ভাইয়েরা আমার
ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বর রক্তে রক্তে সয়লাব
ভ্রম হয় যেন
আমার অক্ষরেরা রক্তমাখা কৃষ্ণচূড়ার বিছানায়
জড়াজড়ি করে পড়ে আছে।

এমন শোকের দিনে শোক করতে নেই
এমন সুখের দিনে কাঁদতে নেই।
ওরা আজ রক্তমূল্যে বাংলাকে বহাল রাখে
সাক্ষী হয়ে থাকে মেডিক্যাল চত্বরের একখণ্ড মাটি
আর হয়ে থাকে সেই মাটির এক চিলতে আকাশ
আমি আমার রক্তমাখা ২১ অনন্তের কোলে তুলে জাদুঘরে রেখে দেব।
আ-মরি বলব
সেই তো আমার রক্তমাখা মাতৃভাষার ইতিহাস
সে তো বাঙালির এক গৌরবমাখা ইতিহাস।

ধুলোর আস্তরণ পড়া খেরোখাতা

মাজেদুল হক

সময়ের কালস্রোতে কেটে যায় সময়-মাস-বছর
ভুলে ভরা এ জীবনে শুধু গুমোট বাঁধা অন্ধকার।

অযাচিত আত্মায় জমে আছে অনেক শৈবাল-ছত্রাক
স্বপ্ন বিলাসের করিডোরে এঁটে আছে উজ্জ্বল স্বর্ণালি দিনগুলি
জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ধুলোর মিহি আস্তরণ পড়ে
মলিন-বিবর্ণ ধূসর হয়ে গেছে
হিসেবের খেরোখাতা...

ভুলে গেছি সম্প্রদায়, নিজের পরিচয়, নামধাম, নিরানন্দ নগর।

অতীতের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি এখনও প্রশ্ন বিদ্ধ করে
মনেপ্রাণে দুঃসহ সাহস নিয়ে সামনের দিকে এগুতে চাই
দূর করে দিতে চাই ফেলে আসা জীবনের
সমস্ত জটিলতা, কুটিলতা
ফিরে পেতে চাই আলোর প্রপাত, প্রাণের সুবাস।

প্রাপকহীন পত্র

সানোয়ার শান্তি

মৃত্তিকা!
তোমার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ নীলাভ্র চোখ
আর রক্তিম শ্বাশত সুন্দর বীণা
স্প্যানিশ গিটারের মতো অনুভূতি প্রবণ
একটু স্পর্শেই বেজে ওঠে অমিত্রাক্ষর ছন্দে
অথচ তুমি আমার-
হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পাও না।
শুক্লপক্ষের রূপবতী রাতে
আমি তো কতবার পত্র দিয়েছি
সমুদ্র হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া বাতাসের কাছে
তোমার সরু পথের বাড়ির ঠিকানায়
আজও সৃষ্টি কিংবা ভাঙনের কোনো দূত
তোমার শ্বাশত বীণায় বাজতে শুনিনি
তাহলে কী আমি ধরে নেব তুমি বাতাস মাখো না
আকাশ দেখো না, জোছনায় ভাসো না।
জীবনে কোনোদিন তোমার পূর্ণাঙ্গ পত্র পাইনি
তুমি ভুল করে ভুল ঠিকানায় পত্র দেবে
তাই পত্র পাবার সাধ রাখছি হৃদয়ারণ্যে।
আমার মুঠোফোনটি যান্ত্রিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ
বহুকাল নিঃশব্দে আছে বেজে ওঠার অপেক্ষায়
পারছে না শুধু তোমার কৃপার অভাবে
মৃত্তিকা জীবনে তো কত ভুলই করলাম
তোমাকে ভুলে যাবার মতো ভুল
আমি কি এ জীবনে করতে পারি বলো?

ভাষার গান

এস এম শহীদুল আলম

ফাগুন এলে আগুন লাগে
গাছের ডালে ডালে
শহিদমিনার কথা বলে
বাংলা ভাষার তালে।

পাখপাখালি বাংলা ভাষায়
কিচিরমিচির করে
ফুল-কলিরাও জেগে ওঠে
শহিদ ভাইয়ের স্বরে
কল কলা কল ধ্বনি দেখি
নদীর খালে খালে।

নীল আকাশে মেঘবালিকা
খুশি মায়ের ডাকে
চাঁদ ও সূর্য ছড়ায় আলো
ভালোবেসে মাকে
সোনা রূপে শিশির কণা
পড়ে টিনের চালে।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

নির্বাচন কমিশনের নতুন ভবনের উদ্‌বোধন

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জনগণ সব সময় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশা করে এবং গণতন্ত্রের জন্য তা অপরিহার্য। তবে নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে হলে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি সব রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, সমর্থকসহ সাধারণ জনগণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা আবশ্যক।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত নির্বাচন ভবনের ফলক উন্মোচন শেষে মোনাজাত করেন –পিআইডি

৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় নির্বাচন কমিশনের নতুন ভবনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণকালে রাষ্ট্রপতি উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন। তিনি আরো বলেন, নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়ে, স্বৈরশাসনের উত্থান ঘটে। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা হয় ভূলুণ্ঠিত। দেশে আজ যে গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দেশ ও জনগণের স্বার্থে তা সম্মিলিতভাবে অব্যাহত রাখতে হবে।

তিনি বলেন, গণতন্ত্রের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এ নির্বাচন। তবে গণতন্ত্রের চর্চা ও বিকাশের জন্য শুধু নির্বাচন অনুষ্ঠানই যথেষ্ট নয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত করতে হলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির পাশাপাশি প্রক্রিয়াগত পরিবর্তনেরও প্রয়োজন রয়েছে। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে সজাগ থাকতে হবে।

দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান

৭ জানুয়ারি ঢাকায় বেগম জেবুন্নেসা এবং কাজী মাহবুবুল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট আয়োজিত ২৮তম মাহবুবুল্লাহ পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে আরো এগিয়ে নিতে সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গিবাদমুক্ত দেশ গড়তে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

তিনি বলেন, মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মধ্যদিয়ে এবং এ ক্ষেত্রে মানবিক চেতনাবোধ থেকে মনের বিকাশ ঘটাতে পারলে মানুষ অমর হয়ে থাকতে পারে। মানবতার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার মাধ্যমেই প্রকৃত সুখ খুঁজে পাওয়া যায়।

তিনি আরো বলেন, শিক্ষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে মানবতার বিকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক সংগঠনগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে।

গণবান্ধব মনোভাব সৃষ্টির আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৫ জানুয়ারি বঙ্গভবনে বার্ষিক পুলিশ সপ্তাহ-২০১৭ উপলক্ষে পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠককালে রাষ্ট্রপতি সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দায়িত্ব পালনে পুলিশ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি পুলিশবাহিনীকে গণমুখী এবং গণবান্ধব মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালনকালে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে হবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে এবং অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে বিশেষ করে সাইবার অপরাধ বন্ধে আরো দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের পরামর্শ দেন। **প্রতিবেদন : মেজবাউল হক**

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ জানুয়ারি ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাসব্যাপী ২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী নতুন বাজার সৃষ্টিতে গবেষণা করার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি রপ্তানি পণ্যের বাজার বহুমুখী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে ২০১৭ সালের জন্য 'প্রোডাক্ট অব দ্য ইয়ার' হিসেবে ঘোষণা করেন। পরে তিনি ২০১৩-১৪ সালে দেশের সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়কারী ৬৬টি প্রতিষ্ঠানের মাঝে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রদান করেন।

সর্বস্তরের জনগণকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ উচ্ছেদে ভূমিকা রাখার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ জানুয়ারি ২০১৭ গণভবন থেকে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রংপুর বিভাগের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার একটাই আহ্বান– বাংলার মাটিতে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের স্থান যেন না হয়।' তিনি শিক্ষক, অভিভাবক এবং ইমামসহ সব শ্রেণি-পেশার জনগণকে জঙ্গিবাদ উচ্ছেদে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. ওয়াজেদ ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ভবন এবং ১০০০ আসনের শেখ হাসিনা ছাত্রী হল-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ জানুয়ারি ২০১৭ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রংপুর বিভাগের জনগণের সঙ্গে কথা বলেন –পিআইডি

মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেন্টার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ জানুয়ারি ২০১৭ নোয়াখালীর স্বর্ণদ্বীপে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ম্যানুভার অনুশীলন ২০১৬ মহড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর দক্ষতা এবং পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেন এবং তারা যে-কোনো অশুভ শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করতে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রস্তুত বলে উল্লেখ করেন। তিনি স্বর্ণদ্বীপে মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেন্টারের উদ্‌বোধন করেন এবং একটি নারকেল গাছের চারা রোপণ করেন। এছাড়া স্বর্ণদ্বীপে আরো ৩টি সাইক্লোন সেন্টার অতি দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পুঁজিবাজারের উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ জানুয়ারি ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নবনির্মিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ভবনের ফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের মূল চালিকাশক্তি অর্থনৈতিক উন্নতি এবং একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার উন্নত অর্থনীতি গড়ে তোলার অন্যতম শর্ত। এলক্ষ্যে একটি স্থিতিশীল, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক পুঁজিবাজার গড়ে তুলতে সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী।

উন্নয়ন মেলার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ জানুয়ারি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী 'উন্নয়ন মেলা ২০১৭'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের সব নাগরিককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং দলমতনির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

জঙ্গি- সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জানুয়ারি ২০১৭ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর স্বদেশে ফেরার ওপর স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে জঙ্গি-সন্ত্রাসীদের কোনো স্থান হবে না। দেশের সকল ধর্মের মানুষ তার অধিকার ভোগ করবে, শান্তিতে বসবাস করবে। এলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মসজিদের ইমামসহ দেশের সচেতন মানুষদের সম্মিলিতভাবে জঙ্গি-সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সভায় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ৪৭তম বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণের জন্য পাঁচ দিনের সরকারি সফরে সুইজারল্যান্ড যান। সুইজারল্যান্ডের জুরিখ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে সুইজারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি শামীম আহসান তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। পরে তাঁকে মোটর শোভাযাত্রা সহকারে সিলভ্রেটা পার্ক হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সফরকালে তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। ১৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ)-এর ৪৭তম বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করেন। সুইজারল্যান্ডের আল্পস অঞ্চলের রিসোর্ট শহর ডাভোসের কংগ্রেস সেন্টারে 'প্রতিবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল নেতৃত্ব' প্রতিপাদ্য নিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ায় হারনিসিং রিজিওনাল কো-অপারেশন বিষয়ক ইন্টারেক্টিভ সেশনে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে তিনি সার্ক অঞ্চলের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সম্মেলনের বাইরে ওয়ার্ল্ড আন্ডার ওয়াটারের ওপর এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, পানি হচ্ছে সম্পদ। টেকসই উন্নয়নের পথে পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয়। অসমতা থেকে সমতায় আনতে বিশুদ্ধ পানি এবং সমুদ্রসম্পদ খাতে এই সহযোগিতা ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৃহত্তর সহযোগিতা আন্তর্দেশীয় বিশুদ্ধ পানি সম্পদের ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং যে-কোনো সহযোগিতা জনগণ, রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থা ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে হতে হবে বলে উল্লেখ করেন।

পুলিশ সেবাকে জনবান্ধব করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩ জানুয়ারি রাজারবাগ পুলিশ লাইনস-এ 'পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী পুলিশবাহিনীর সদস্যদের প্রশংসা করেন এবং তারা দেশেই নয়, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে নিজেদের কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে বহির্বিশ্বে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ রাজারবাগ পুলিশ লাইনস-এ পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭ অনুষ্ঠানে পুলিশ সদস্যদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন –পিআইডি

প্রত্যেক পুলিশ সদস্যকে অসহায় ও বিপন্ন মানুষের প্রতি সেবার হাত প্রসারিত করার নির্দেশ দেন এবং ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে একাত্ম হয়ে পুলিশ সেবাকে আরো জনবান্ধব করার আহ্বান জানান। তিনি ৪টি ক্যাটাগরিতে ১৩২ পুলিশ সদস্যের মাঝে 'বাংলাদেশ পুলিশ পদক ও রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক' বিতরণ করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, সিআইডি'র ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরি, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও একাত্তরের বীর শহিদদের স্মরণে নির্মিত 'রাজারবাগ ৭১' নামের আবক্ষ মূর্তির নামফলক উন্মোচন করেন।

পুলিশবাহিনীকে সব সময় সতর্ক থাকার পরামর্শ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ জানুয়ারি তাঁর কার্যালয়ে 'পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭' উপলক্ষে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস ও জঙ্গি হামলা মোকাবিলায় পুলিশের সাহসী ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং তাদের ওপর জনগণের আস্থাকে বাড়ানোর যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় অধিক জনগণকে সম্পৃক্ত করার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে বহির্বিশ্বে এবং দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র চলছে। এলক্ষ্যে তিনি পুলিশ সদস্যদের সব সময় সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

প্রকৌশলীদের সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ জানুয়ারি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন চট্টগ্রাম প্রাঙ্গণে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৫৭তম কনভেনশন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী প্রকৌশলীদের কাজের প্রশংসা করেন এবং প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নে তাদের প্রতি সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে সোচ্চার হওয়ার জন্য সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে গণসচেতনতা গড়ে তোলতে প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান।

স্মারক ডাকটিকেট, উদ্‌বোধনী খাম ও ডাটা কার্ড উন্মোচন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ জানুয়ারি সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী 'আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস ২০১৭' উপলক্ষে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকেট, ১০ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্‌বোধনী খাম, ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটা কার্ড এবং একটি বিশেষ সিলমোহর উন্মোচন করেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

মানুষ তার মায়ের পরিচয়েই বড়ো হতে পারে

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২৩ জানুয়ারি রাজধানীতে বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান মিলনায়তনে প্রকাশনা সংস্থা অন্যপ্রকাশ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেন, যুদ্ধশিশুরা লুকিয়ে থাকলে, সত্যিকার পাপিষ্ঠ হানাদাররা প্রশ্রয় পাবে; তাই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে তাদের। মানুষ তার মায়ের পরিচয়েই বড়ো হতে পারে, ধর্মেও এতে কোনো বাধা নেই।

মন্ত্রী বলেন, যুদ্ধশিশু এবং বীর মাতারা কোনো পাপ করেনি, তাদের মমতা এবং সম্মান দেবার সৎ সাহস অর্জন করতে হবে আমাদের। তিনি আরো বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি পুরুষেরা আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষার দুই যুদ্ধ করেছেন আর নারীরা করেছেন তিন যুদ্ধ। আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষার সাথে তাদের ইজ্জত রক্ষার যুদ্ধও করতে হয়েছে। অনেক নারীকেই সব হারাতে হয়েছে কিন্তু তারা কোনো আপোশ করেননি। সেই বীর নারীরা বীর মাতার সম্মানের পাত্র আর তাদের গর্ভের নিষ্পাপ শিশুরাও মমতার দাবিদার।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ জাতীয় জাদুঘরে বরেণ্য বংশীবাদক ওস্তাদ আজিজুল ইসলামের পাঁচ দিনব্যাপী বাঁশি সম্মেলনের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন – পিআইডি

তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ কাস্টমস বাড়াবে রাজস্ব আয়

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষে যশোরের বেনাপোল কাস্টমস হাউজ আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, রাজস্ব আয় দেশের অর্থনীতির অক্সিজেন। তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ কাস্টমস ব্যবস্থাপনা রাজস্ব আয় বাড়াবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের পথ ধরে বিশ্বমানের কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় উন্নীত হবে দেশ।

এ সময় দেশীয় উৎপাদন, ব্যবসা ও আমদানি-রপ্তানি বাড়াতে দেশে শান্তি বজায় রাখার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, শান্তি ও উন্নয়নের সবচেয়ে বড়ো শত্রু জঙ্গিবাদ দমনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। **প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন**

নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : পূর্ণতা পেল স্বাধীনতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হয়েছে ১০ জানুয়ারি। দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জনের পর ১৯৭২ সালের এই দিনে পাকিস্তানে দীর্ঘ কারাবাস শেষে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে আসেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। এতে পূর্ণতা পায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দিনটি অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে তার ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাসা থেকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের মিনওয়ালি কারাগারে আটক রাখে। কারাগারে বন্দি করা হলেও বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার নামেই চলে মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে '৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি। লন্ডন-দিল্লি হয়ে তিনি ঢাকায় পৌঁছেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। সেদিন বাংলাদেশে ছিল এক উৎসবের আমেজ। গোটা বাঙালি জাতি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল কখন তাদের প্রিয় নেতা, স্বাধীন বাংলার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীন দেশের মাটিতে আসবেন। পুরো দেশের মানুষই যেন জড়ো হয়েছিল তেজগাঁওস্থ ঢাকা বিমানবন্দর এলাকায়। বিমানবন্দর থেকে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পর্যন্ত রাস্তায় জনতার ঢল নামে। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বলেন, যতদিন বাংলাদেশ ও বাঙালি থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু সবার অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই বাঙালির বিজয় পূর্ণতা লাভ করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জানুয়ারি ২০১৭ ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে দলীয় নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন – পিআইডি

যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়েছে। সকাল সাড়ে ৬টায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু ভবনসহ সারাদেশে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল ৭টায় বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, দুপুর আড়াইটায় ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা আয়োজনের মধ্যদিয়ে দিবসটি পালিত হয়েছে।। জনসভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এছাড়া দেশের প্রতিটি জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে আওয়ামী লীগ এবং সকল সহযোগী সংগঠন কেন্দ্রীয় কমিটির অনুরূপ কর্মসূচি পালন করে। আওয়ামী লীগ ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করে ।

প্রতিবেদন : মো. লিয়াকত হোসেন ভূঞা

বাণিজ্য মেলা উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

১ জানুয়ারি: শেরেবাংলা নগরে ২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাসব্যাপী এ মেলা উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে ২০১৭ সালের জন্য 'প্রডাক্ট অব দ্য ইয়ার' (জাতীয় বার্ষিক পণ্য) ঘোষণা করেন।

দেশজুড়ে পাঠ্যপুস্তক উৎসব

❑ ঢাকাসহ সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনে উদ্‌যাপিত হয় পাঠ্যপুস্তক উৎসব।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

২ জানুয়ারি: সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৬'-এর খসড়া এবং 'হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন লাভ করে।

জাতীয় সমাজ সেবা দিবস

❑ নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে 'জাতীয় সমাজ সেবা দিবস' পালিত হয়। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সমাজ সেবার উদ্ভাবন, এবার সেবায় ডিজিটালাইজেশন'।

একনেকে ৬ প্রকল্প অনুমোদন

৩ জানুয়ারি: শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ১৫৬টি উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধিসহ ৬ প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী

৪ জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রংপুর বিভাগের পাঁচ জেলার জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. ওয়াজেদ মিয়া রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ভবন ও ১০০০ আসনের শেখ হাসিনা ছাত্রী হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

স্বর্ণদ্বীপে মহড়া অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

৭ জানুয়ারি: নোয়াখালীর স্বর্ণদ্বীপে সেনাবাহিনীর ম্যানুভার অনুশীলন-২০১৬ মহড়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সশস্ত্রবাহিনীকে সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায়

৭ জানুয়ারি ২০১৭ নোয়াখালীর স্বর্ণদ্বীপে (জাহাইজ্জারচর) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ম্যানুভার অনুশীলন মহড়া শেষে ৩৩ পদাতিক ডিভিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট উপহার দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে – পিআইডি

ঐক্যবদ্ধ থেকে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের যে-কোনো হুমকি মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

সারাদেশে উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত

৯ জানুয়ারি: দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় 'উন্নয়ন মেলা ২০১৭'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর উদ্‌বোধন করেন। দেশের সব জেলা-উপজেলায় তিন দিনব্যাপী এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাও জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন ২০১৬-এর অনুমোদন দেওয়া হয় এবং তিতাস গ্যাসের সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপনে বন বিভাগের ১৩ হাজার ৩৫৬টি গাছ কাটার সিদ্ধান্ত হয়।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত

১০ জানুয়ারি: নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হয়।

একনেক বৈঠকে ৯ প্রকল্প অনুমোদন

❑ এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে গ্রামে শতাধিক সেতু নির্মাণসহ ৯ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে ৮ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশে ভাষণ

১২ জানুয়ারি: সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন বছরে তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও অর্জনের কথা তুলে ধরেন।

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্‌বোধন

❑ রাজধানীর জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে ১৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্‌বোধন করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। অনুষ্ঠানে তিনি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার জন্য চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক ও কলাকুশলীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত

১৩ জানুয়ারি: মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব এবং ২০ জানুয়ারি দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। ২২ জানুয়ারি আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

২২ জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত ৪৬তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে লেখাপড়ার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চায় সমান গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান।

পুলিশের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

২৩ জানুয়ারি: রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস-এ 'পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭' উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ঔপনিবেশিক আমলের ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে পুলিশবাহিনীকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে একাত্ম ও আরো জনবান্ধব হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পুলিশের প্রতি রাষ্ট্রপতি

২৫ জানুয়ারি: পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭ উপলক্ষে বঙ্গভবনের দরবার হলে এক অনুষ্ঠানে পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জনগণকে যথাযথ সেবা প্রদানে পুলিশবাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান।

গোপালগঞ্জে রোভার মুট-এর উদ্‌বোধন

২৬ জানুয়ারি: গোপালগঞ্জের মানিকদহ আবাসিক এলাকায় সপ্তাহব্যাপী ১১তম 'জাতীয় রোভার মুট'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং চালুর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

২৬ জানুয়ারি ২০১৭ গোপালগঞ্জ সদরের মানিকদহে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের হাউজিং প্রকল্পে একাদশ জাতীয় রোভার মুটের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয় – পিআইডি

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপন করে (এনবিআর) 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় উপাত্ত বিশ্লেষণ'।

আইইবি-এর ৫৭তম কনভেনশনে প্রধানমন্ত্রী

২৮ জানুয়ারি: ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন চট্টগ্রাম প্রাঙ্গণে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৫৭তম কনভেনশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকৌশলীদের উদ্দেশে বলেন, 'নির্মাণ কাজ যেন পরিবেশবান্ধব হয়। আমাদের জলাভূমি যেন রক্ষা পায়। নদীনালা, খালবিল যেন রক্ষা পায়। পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন নির্মাণ কাজ আমরা চাই'।

প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্‌বোধন

২৯ জানুয়ারি: ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭' উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ তৈরিতে জনপ্রতিনিধিসহ বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে 'বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস'।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

৩০ জানুয়ারি: সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৭ এবং শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৭'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন লাভ করে। এছাড়াও বৈঠকে 'যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৭' অনুমোদিত হয়।

একনেক বৈঠক

৩১ জানুয়ারি : এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি'র (একনেক) বৈঠকে সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার মোট ৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন : আখতার শাহীমা হক

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে সড়কপথে রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ নিরাপদ, সময় সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক করতে ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের জাতীয় মহাসড়কের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। এটি বাংলাদেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে। এই মহাসড়কের থাকছে ৬টি ফ্লাইওভার, ৪টি রেলওয়ে ওভারপাস, ১৫টি আন্ডারপাসসহ তিনটি ইন্টারচেঞ্জ। প্রকল্পের মহাসড়ক অংশ দিয়ে চলবে দ্রুতগতির গাড়ি। ধীরগতি বা

লোকাল যানবাহনের জন্য থাকবে আলাদা লেন। লোকাল যানবাহন নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া এ মহাসড়কে উঠতে পারবে না।

আম উৎপাদনে বিশ্বে সপ্তম বাংলাদেশ

পৃথিবীতে আম উৎপাদনকারী শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সপ্তম এবং প্রতিবছর প্রায় ১ মিলিয়ন টন আম বাংলাদেশে উৎপাদন

বাংলাদেশের সুস্বাদু ফল আম

হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমের চাষ বৃদ্ধির কারণে গত বছর প্রায় ৩০০ টন আম রপ্তানি হয়েছে।

অনলাইনে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স

বিদেশগামী বা বিদেশে বসবাসকারীরা পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য এখন থেকে ঘরে বসে কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে। সশরীরে থানায় যেতে হবে না। আবেদনের জন্য www.police.bd অ্যাড্রেসে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সরকারি ফি পরিশোধের চালান স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

বঙ্গোপসাগরে মিলল বিপুল খনিজ

বঙ্গোপসাগরের ১৩টি স্থানে ভারী খনিজ বালু পাওয়া গেছে। এ বালু ইলমোনাইট, গার্নেট, সিলিমানাইট, জিরকন, রুটাইল ও ম্যাগনেটাইটসমৃদ্ধ। বাংলাদেশ ও জার্মানির যৌথ জরিপে সাগরের ৮০ থেকে ১১০ মিটার গভীরতায় এই মূল্যবান খনিজ সম্পদের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক

পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, আলু, আটা, ময়দা, মরিচ, হলুদ, ধনিয়া এবং তুস-খুদ কুড়ার মোড়ক হিসেবে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা তফসিলে এসব পণ্য যুক্ত করে গেজেট জারি করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পণ্যের ওজন ২০ কেজির বেশি হলে প্রযোজ্য হবে এই নিয়ম। ২০১৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার ও চিনি সংরক্ষণ ও পরিবহণে বাধ্যতামূলকভাবে পাটের ব্যাগ ব্যবহারের নির্দেশ দেয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। এই ছয় পণ্যের সাথে যুক্ত হলো আরো ১১টি পণ্য। এই আইন না মানলে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলে শাস্তি সর্বোচ্চ দণ্ডের দ্বিগুণ হবে। **প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ**

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

রংপুরের জনগণের সঙ্গে মতবিনিময়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ জানুয়ারি ২০১৭ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রংপুর বিভাগের পাঁচ জেলার জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে রংপুর বিভাগের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. ওয়াজেদ মিয়া রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ভবন এবং ১০০০ আসনের শেখ হাসিনা ছাত্রী হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী।

৪৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ

সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলা সম্মেলন কক্ষে ১৪ জানুয়ারি ২০১৭ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের আয়োজনে শিক্ষা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ জানুয়ারি ২০১৭ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ৪৬তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করেন – পিআইডি

মন্ত্রণালয়ের পিইডিপি'র অর্থায়নে ৪৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এই প্রজেক্টর বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন এবং মৌলিক শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারবে না বলে উল্লেখ করেন।

লেখাপড়ার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চা করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ জানুয়ারি ২০১৭ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত ৪৬তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকাসক্তি থেকে ছেলেমেয়েদের দূরে থাকতে হবে। এলক্ষ্যে তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে লেখাপড়ার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চায় সমান গুরুত্ব প্রদানে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। পরে প্রধানমন্ত্রী প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং চালুর আহ্বান

গোপালগঞ্জের মানিকদহ আবাসিক এলাকায় ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ সপ্তাহব্যাপী ১১তম জাতীয় রোভার মুট-এর উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং চালুর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্‌বোধন

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২৯ জানুয়ারি 'শিক্ষার আলো জ্বালাবো, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব'–প্রতিপাদ্য নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজন করে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭'। এর উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ তৈরিতে জনপ্রতিনিধিসহ বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে উল্লেখ করেন এবং প্রতিটি শিশুকে মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশপ্রেমিক ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। পরে প্রধানমন্ত্রী ১৯ জন কর্মকর্তা, শিক্ষক, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, ইনস্ট্রাকটর ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

বিজেএস পরীক্ষার মেধাতালিকায় সামনের সারিতে নারীরা

নবম বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষায় সহকারী জজ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ৩৭ জন নারী। এর মধ্যে মেধাতালিকায় প্রথম থেকে ৬ষ্ঠ স্থান (তৃতীয় স্থান বাদে) পর্যন্ত জায়গা করে নিয়েছেন তারা। ৮ জানুয়ারি জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সহকারী জজ নিয়োগের যে প্রজ্ঞাপন জারি করে তাতে এ তথ্য পাওয়া যায়।

প্রজ্ঞাপনে দেখা যায়, সহকারী জজ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মোট ৭৯ জন। এর মধ্যে ৩৭ জনই নারী। মেধাতালিকায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে ৬ জনই নারী। মেধাক্রমে নিয়োগ পাওয়া বাকি ৫৯ জনের মধ্যে ৩১ জনই নারী।

যৌতুক নিরোধ আইনের খসড়া অনুমোদন

যৌতুকের জন্য কোনো নারীকে মারাত্মক জখম করলে দায়ী ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন অথবা অন্যূন ১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়ার বিধান রেখে 'যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৭'-এর নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ৩০ জানুয়ারি সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

নতুন আইনের খসড়া অনুযায়ী, যৌতুকের জন্য কোনো নারীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করলে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। এ আইনে মিথ্যা মামলা করলে তাতেও শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান, আগের আইন ও অধ্যাদেশগুলোর সমন্বয় করে নতুন আইনটি করা হচ্ছে। ১৯৮০ সালে আইনটি ইংরেজি ভাষায় প্রণয়ন করা হয়, এবার বাংলায় করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী

বাংলাদেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী সাইদা খানম। সম্প্রতি ছবি মেলার নবম আসরে তাঁকে দেওয়া হয়েছে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার।

৬৫ বছর বয়সি সাইদা খানম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সত্যজিৎ রায়, রানি এলিজাবেথ, মাদার তেরেসা, সুফিয়া কামাল, নিল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন, মাইকেল কলিন্সসহ বিখ্যাত সব মানুষদের ছবি তুলেছেন তাঁর ক্যামেরায়।

সৌদি আরবে প্রথম নারী দিবস পালন

রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার ইতিহাস ভেঙে প্রথমবারের মতো নারী দিবস পালন করেছে সৌদি আরব। সৌদি রাজবংশের আয়োজনে ১ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চারদিনব্যাপী রাজধানী রিয়াদের কিং ফাহাদ সংস্কৃতি কেন্দ্রে চলে এ দিবসের অনুষ্ঠান।

রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সৌদি নারী আন্দোলনের পরিচিত মুখ রাজকুমারী প্রিন্সেস আল-জাওহারা বিনতে ফাহাদ আল সউদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তারা নারী উন্নয়নের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। **প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী**

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

ডাক্তারের ফি ও চিকিৎসা ব্যয় নির্ধারণ আইন

সরকার প্রায় ৩৪ বছর পর চিকিৎসকদের ফি পুনঃনির্ধারণ ও চিকিৎসা ব্যয় নিয়ে বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন ২০১৬-এর খসড়া প্রস্তুত করেছে। সম্প্রতি এক বৈঠকে এ আইনের খসড়া নিয়ে আলোচনা শেষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সাংবাদিকদের এ আইন সম্পর্কে অবহিত করেন।

নতুন এ আইন অনুযায়ী, চিকিৎসকগণ সরকার নির্ধারিত ফি'র তালিকা চেম্বারের সামনে ঝুলিয়ে রাখতে বাধ্য থাকবেন এবং ফি বাবদ রোগীকে রশিদ দেবেন। রশিদের মুড়ি ডাক্তার নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করতে বাধ্য থাকবেন। অফিস সময়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিগত চেম্বারে রোগী দেখতে পারবেন না। ছুটির দিনে নিজ জেলার বাইরে গিয়ে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা চেম্বারে রোগী দেখতে পারবেন না।

চিকিৎসকদের জন্য আচরণবিধি চূড়ান্ত

চিকিৎসকদের জন্য একটি আচরণবিধি চূড়ান্ত করেছে সরকার। খুব তাড়াতাড়িই তা দেশের সকল চিকিৎসকের কাছে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) কার্যনির্বাহী কমিটির একটি প্রতিনিধিদল ১৫ জানুয়ারি সচিবালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এসব তথ্য জানান।

ছাপানো প্রেসক্রিপশন বা হাতে লেখার ক্ষেত্রে বড়ো অক্ষর ব্যবহারের জন্য চিকিৎসকদের প্রতি আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নে দ্রুত একটি প্রজ্ঞাপন জারির কথাও মন্ত্রী উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে চিকিৎসকেরা তাদের প্রেসক্রিপশন প্যাড বা ভিজিটিং কার্ডে

বিএমডিসি'র নিবন্ধনকৃত ডিগ্রি ছাড়া অন্য কোনো ডিগ্রি ব্যবহার যেন না করতে পারেন সে বিষয়েও প্রজ্ঞাপনে নির্দেশনা থাকছে।

হাসপাতালে ফ্রি বেড সুবিধা

বেসরকারি হাসপাতালে দরিদ্র রোগীদের জন্য নির্ধারিত ফ্রি বেড সুবিধা বাস্তবায়নে কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। দেশের অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতালে ফ্রি বেড সুবিধা নেই বলে অভিযোগ ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নীতিমালায় লাইসেন্স প্রাপ্তির শর্ত হিসেবে বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ১০ শতাংশ শয্যা গরিবদের জন্য ফ্রি রাখার বিধান রয়েছে। অঙ্গীকার করার পরও কেউ কেউ এ বিধান মানছে না। তাই অধিদপ্তর থেকে মনিটরিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। সেখান থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এসব হাসপাতাল বা ক্লিনিকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ৮ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস কোর্সের নতুন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন – পিআইডি

চিকিৎসায় সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার অঙ্গীকার

রোগীর স্বার্থ রক্ষায় চিকিৎসার সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে পেশাচর্চার অঙ্গীকার করেছে ভবিষ্যতের চিকিৎসকেরা। ৮ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীরা এ শপথ নেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, সরকার মেডিকেল শিক্ষার মান নিয়ে কোনো ছাড় দেবে না। ভালো চিকিৎসক হতে হলে পড়ালেখাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাজনীতিকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

চিকিৎসকদের সহায়তা করবে ই-কিউর

ডিজিটাল পদ্ধতিতে রোগীদের ওষুধের জেনেটিক নামসহ প্রেসক্রিপশন প্রদানে চিকিৎসকদের সহায়তা করবে 'ই-কিউর' প্রেসক্রিপশন সফটওয়্যার ও অ্যাপস। ১৭ জানুয়ারি রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

ই-কিউরে থাকবে রোগীর মেডিকেল ইতিহাস, চিকিৎসা পরামর্শ, এসএমএস নোটিফিকেশন, নাম ও আইডি দিয়ে অনুসন্ধান, অনলাইনে অ্যাপয়েনমেন্ট, বিল পরিশোধসহ নানা সুবিধা। বিনামূল্যে চিকিৎসকদের একটি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে। যার মাধ্যমে যে-কোনো চিকিৎসক উচ্চ আদালত প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রেসক্রিপশন দিতে পারবেন।

প্রতিবেদন : আশরাফ উদ্দিন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার

সামগ্রিক সাহিত্যকর্মে বিশেষ অবদানের জন্য 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬' পেয়েছেন সাতজন লেখক-সাহিত্যিক। তারা হলেন–কবিতায় আবু হাসান শাহরিয়ার, কথাসাহিত্যে শাহাদুজ্জামান, প্রবন্ধ ও গবেষণায় মোরশেদ শফিউল হাসান, অনুবাদে নিয়াজ জামান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যে এম এ হাসান, আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথায় নূরজাহান বোস, শিশু সাহিত্যে রাশেদ রউফ। ২ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭' উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষার মাসের প্রথম দিনেই বাংলা একাডেমিতে মাসব্যাপী বাঙালির অনন্য উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। একই মঞ্চে তিনি চারদিনের 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন' এর উদ্‌বোধন করেন এবং বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। মেলার উদ্‌বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকে জানতে জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের বেশি করে বই পড়ায় আহ্বান জানান।

জয়নুল উৎসব ২০১৬

শ্রদ্ধায় ও ফুলেল শুভেচ্ছায় অনুষ্ঠিত হয় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১০২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'জয়নুল উৎসব ২০১৬'। এ উপলক্ষে বাংলার লোকজ শিল্পের পসরা বসেছিল ব্যস্ত শহরের চারুকলা অনুষদের প্রাঙ্গণ জুড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ তিন দিনব্যাপী এ উৎসবের আয়োজন করে। উৎসবে জয়নুল মেলা

জয়নুল উৎসব

ছাড়াও ছিল জয়নুল সম্মাননা, শিল্পাচার্যের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন এবং অলোচনাসহ আরো অনেক কিছু।

মঞ্চে মাইকেল মধুসূদন

বাংলা নাটকের সূচনাকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সেই মাইকেলকে মঞ্চে আনল নাটকের দল 'প্রাঙ্গণ মোর'। ২৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে উদ্‌বোধনী মঞ্চায়ন হয় নাটকটি।

দাঁড়াও....জন্মো যদি তব বঙ্গে নামে নাটকটি রচনা করেছেন অপূর্ব কুমার। নির্দেশনা ও মাইকেলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনন্ত হিরা। **প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা**

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

একুশে বইমেলা অমর একুশের স্মৃতি বিজড়িত মেলা। প্রতিবছর পুরো ফেব্রুয়ারি জুড়ে এই মেলা বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৪ সাল থেকে অমর একুশে বইমেলা বাংলা একাডেমির পাশাপাশি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার জন্য আত্মত্যাগের স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই এই মাসে আয়োজিত এই বইমেলার নামকরণ করা হয়, অমর একুশে গ্রন্থ মেলা।

১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে বটতলায় এক টুকরো চটের ওপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। এই ৩২টি বই ছিল চিত্তরঞ্জন সাহা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমান মুক্তধারা প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা। এই বইগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রথম অবদান। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি একাই বইমেলা চালিয়ে যান। ১৯৭৬ সাল থেকে অন্যান্যরা অনুপ্রাণিত হন। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমিকে মেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন। ১৯৭৯ সালে মেলার সাথে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি; এই সংস্থাটিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রয়াত চিত্তরঞ্জন সাহা। ১৯৮৩ সালে কাজী মনজুর-এ মওলা বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে বাংলা একাডেমিতে প্রথম 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র আয়োজন সম্পন্ন করেন। বাংলা একাডেমি চত্বরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ২০১৪ সাল থেকে বইমেলা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

মেলা চলাকালীন প্রতিদিনই মেলাতে বিভিন্ন আলোচনাসভা, কবিতা পাঠের আসর বসে; প্রতি সন্ধ্যায় থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া মেলাতে লেখককুঞ্জ রয়েছে, যেখানে লেখকেরা উপস্থিত থাকেন এবং তাঁদের বইয়ের ব্যাপারে পাঠক ও দর্শকদের সাথে মতবিনিময় করেন। মেলার তথ্যকেন্দ্র থেকে প্রতিনিয়ত নতুন মোড়ক উন্মোচিত বইগুলোর নাম, তদীয় লেখক ও প্রকাশকের নাম ঘোষণা করা হয় ও দৈনিক প্রকাশিত বইয়ের সামগ্রিক তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন রেডিও ও টেলিভিশন চ্যানেল মেলার মিডিয়া স্পন্সর হয়ে মেলার তাৎক্ষণিক খবরাখবর দর্শক শ্রোতাদেরকে অবহিত করে। এছাড়াও মেলার প্রবেশদ্বারের পাশেই স্টল স্থাপন করে বিভিন্ন রক্ত সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে রক্ত সংগ্রহ করে থাকে।

মেলায় বেশ কিছু সরকারি অফিসের স্টল দেখা যায়, যেখান থেকে তথ্যমূলক গুরুত্বপূর্ণ বই ক্রেতারা কম দামে ক্রয় করতে পারেন। বাংলা একাডেমি, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, শিশু একাডেমি, পর্যটন কর্পোরেশন, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামী ফাউন্ডেশন, পিআইবিসহ বেশ কিছু সরকারি স্টল সরকারের মুখপত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া বিশ্বের বড়ো বড়ো লেখকদের বই আছে মেলায়। বিপুল বইয়ের সমাবেশ ঘটায় মেলা থেকে নিজ নিজ চাহিদা অনুযায়ী বই সংগ্রহ করতে পারে সবাই।

২০১০ সাল থেকে এই মেলার প্রবর্তক জনাব চিত্তরঞ্জন সাহার নামে 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে প্রকাশিত বইয়ের গুণমান বিচারে সেরা বইয়ের জন্য প্রকাশককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া স্টল ও অঙ্গসজ্জার জন্য দেওয়া হয় 'সরদার জয়েনদীন স্মৃতি পুরস্কার'। সর্বাধিক গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য সেরা ক্রেতাকে দেওয়া হয় 'পলান সরকার পুরস্কার'।

মেলায় কোন কোন প্রকাশনা সংস্থার স্টল স্থান পাবে, কেমন স্টল করতে পারবে, তার জন্য বাংলা একাডেমির আলাদা কমিটি গঠিত হয়। ২০১০ সাল থেকে এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কিছুটা কড়াকড়ি আরোপ করা হয়; প্রকাশিত বইয়ের কপি জাতীয় আর্কাইভ ও জাতীয় গণগ্রন্থাগারে জমা দেওয়া হয়েছে কিনা, কর-নির্দেশক নম্বর (TIN) ঠিক আছে কিনা–যাচাই করার পাশাপাশি প্রকাশিত নতুন বইয়ের কপি বাংলা একাডেমির তথ্যকেন্দ্রে জমা দেওয়ার বিষয়টিও বাধ্যতামূলক করা হয়। মেলা আয়োজনের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

প্রতিবেদন : মো. জাকির হোসেন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

সব খাতে আইসিটির ব্যবহার

ডিজিটাল বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মানবসম্পদ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) শিল্পের উন্নয়ন, যোগাযোগ স্থাপন ও ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা–এ চারটি বিষয়ের ওপর ভর করে। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের গত তিন বছরের অর্জন এবং ২০১৭–১৮ সালের কর্ম পরিকল্পনা তুলে ধরার জন্য ১২ জানুয়ারি ২০১৭ রাজধানীর আইসিটি টাওয়ারের বিসিসি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২ জানুয়ারি ২০১৭ সোনারগাঁও হোটেলে নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ই-লার্নিং রিসোর্স অ্যান্ড ই-ম্যানুয়াল-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন – পিআইডি

সম্মেলনে জানানো হয়, ২৫ হাজার শিক্ষার্থী উদ্যোক্তা ফ্রিল্যান্সারের অংশগ্রহণে বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাদের মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ২৩৫ জনের। শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগে ১৬৭টি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম তৈরিতে তিন স্তরের 'পিরামিড স্ট্রাকচার'

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক জানান, বাংলাদেশ স্টার্ট-আপ ইকো সিস্টেম তৈরি করতে তিন স্তরের একটি পিরামিড স্ট্রাকচারের ভাবনা চলছে। ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ রাজধানীর জনতা টাওয়ারস্থ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে 'ক্রিয়েটিং এ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইকোসিস্টেম: গভর্নমেন্ট রোল' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি জানান, এ স্ট্রাকচারে সবচেয়ে উপরে থাকবে উদ্ভাবনকারীরা। এরপর স্ট্রাকচারে সফলকারী ব্যক্তিরা (যারা আইটি আইটিএস গ্রাজুয়েশন করে কোম্পানির সিইও বা সিএক্স বা সিএফও) স্থান পাবে। সবশেষে থাকবেন ফ্রিল্যান্সিং খাতসহ অন্যান্য খাতে সংশ্লিষ্ট জড়িত ব্যক্তিরা। এভাবেই দেশে একটি অনন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইকো-সিস্টেম তৈরি করার কাজ চলছে।

নতুন বছরে শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল বই পাচ্ছে

দেশে প্রথমবারের মতো নবম ও দশম শ্রেণির জন্য চালু হচ্ছে ই-লার্নিং ও ই-ম্যানুয়েল কনটেন্ট। যার ফলে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে নিজেদের পাঠ নিতে পারবে আবার শিক্ষকরাও ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পূর্ণ গাইডলাইন পাবে। টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ প্রকল্পের আওতায় এথিক্স অ্যাডভান্সড টেকনোলজি লিমিটেড (ইএটিএল)-এর কারিগরি সহযোগিতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সামগ্রিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে এসব কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে।

২ জানুয়ারি ২০১৭ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রধান অতিথি হিসেবে ডিজিটাল বই উদ্‌বোধন করেন। মন্ত্রী বলেন, 'বইয়ের বোঝা কমাতে ই-পাঠ্যপুস্তক তৈরির কাজ শুরু করেছি। বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে নবম-দশম শ্রেণির সব বই ই-লার্নিং হচ্ছে'।

২০২১ সালের মধ্যে ২০ লাখ তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী তৈরির উদ্যোগ চলছে

তথ্যপ্রযুক্তি খাত থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ সময়েই ২০ লাখের বেশি তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী তৈরি করা হবে। এজন্য সারাদেশে কানেক্টিভিটি তৈরি করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, কানেক্টিভিটি বা যোগাযোগের মাধ্যম ছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দ্বিতীয় মেয়াদে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও সেবা প্রদানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। সরকারি কার্যক্রম ও সেবা প্রদান পদ্ধতির ডিজিটাইজড করা হয়েছে। **প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি**

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

শেষ হলো আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা

কৃষি প্রযুক্তিকে মানুষের কাছে পরিচিত করানো এবং সহজলভ্য করার জন্য রাজধানীতে হয়ে গেল সপ্তম আন্তর্জাতিক 'কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৭'। ১১ জানুয়ারি রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে তিনদিনব্যাপী মেলাটি যৌথভাবে আয়োজন করে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) এবং লিমরা ট্রেড ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিউশন প্রা.লি.। মেলায় কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশি ও বিদেশি প্রায় ৩৬৫ টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। মেলায় দেশের উৎপাদিত কৃষি ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ও হালকা প্রকৌশল যন্ত্রপাতি, ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত উন্নতমানের মেশিনারি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি, কৃষিপণ্য, উদ্যান ফসলের উন্নয়ন প্রযুক্তি, বীজ ও বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি, সৌরবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস জেনারেটর, ডিজেল জেনারেটর, সেচ পানির পাম্প, পিভিসি ও প্লাস্টিক যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করা হয়।

কৃষি সেবায় যুক্ত হয়েছে তিন অ্যাপ

'কৃষকের জানালা', 'কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা' ও 'বালাইনাশক নির্দেশিকা' নামের তিনটি অ্যাপ যুক্ত হয়েছে কৃষি সেবায়। কৃষককে তার প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে, ফসলের সমস্যা বুঝতে ও সমাধান জানতে আর দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে না। মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে ঘরে বসেই এখন যাবতীয় তথ্য পাবেন কৃষক। গত ৪ জানুয়ারি রাজধানীর খামারবাড়ি আ.কা.মু. গিয়াসউদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়ামে মোবাইল অ্যাপভিত্তিক তিন সেবার উদ্‌বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর (ডিএই) যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

'কৃষকের জানালা' অ্যাপটি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবদুল মালেক, 'বালাইনাশক নির্দেশিকা' উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সুকল্প দাস এবং 'কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা' উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মুহাম্মদ শাহাদৎ হোসাইন সিদ্দিকী উদ্ভাবন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী দেশের কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

জনপ্রিয়তা বাড়ছে ভিয়েতনামি নারকেল চাষের

ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ভিয়েতনামি নারকেল চাষ। ইতোমধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর বেশকিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে।

ভিয়েতনামী নারিকেলের চারা

এরই আওতায় পাহাড়ি ও উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১ লাখ ৮০ হাজার চারা বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উদ্যোগে ২০১৫ সালের জুলাই থেকে এ প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। পরে বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের লক্ষ্যে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। সূত্র মতে, দেশি নারকেল গাছে ফলন আসতে ৯-১০ বছর লেগে যায়। ফলনও হয় কম। আবার গাছ বেশি বড়ো হলে ঝড়ে ভেঙ্গে যায়। অন্য দিকে ভিয়েতনামের নারকেল চারা রোপণের আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যে গাছে নারকেল ধরে। একটি গাছে বছরে ১৫০টিরও বেশি নারকেল পাওয়া যায়। তিন থেকে চার ফুটের মধ্যেই উচ্চতা সীমাবদ্ধ থাকে। প্রকল্প পরিচালক মেহেদি মাসুদ বলেন, ভিয়েতনামের আবহাওয়ার সঙ্গে মিল থাকায় আমাদের দেশে ভিয়েতনামের নারকেল চাষে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। **প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক উৎসব

ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরো গভীর করতে ঢাকায় প্রথমবারে মতো অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক উৎসব-২০১৭'। তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক পর্ষদের এ আয়োজনের সহযোগিতায় ছিল সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। এ উৎসবের উদ্‌বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নন্দন মঞ্চ, জাতীয়

বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন

নাট্যশালা, পরীক্ষণ থিয়েটার হল, স্টুডিও থিয়েটার হল, সেমিনার রুম ও চারুকলা গ্যালারিতে ছিল এ উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা।

বাঁশির সুরে সতেজ সকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলায় শুক্রবারের সকালটা বাঁশির সুরে সতেজ ছিল। মারমা, মণিপুরি, গারো, রাখাইন, সাঁওতাল, চাকমা, হাজং, ওরাঁও, ত্রিপুরা ও খাসিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা তাদের নানারকমের পরিবেশনায় মুগ্ধ করে সবাইকে। এক পাশে মুরং জনগোষ্ঠীর বাঁশির সুর, অন্য পাশে শত বছর ধরে চলা সাঁওতালদের বিয়ের নাচ। এর বাইরেও ঢাকঢোল, পাহাড়ি নাচসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ঐতিহ্যগত পরিবেশনায় এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ছিল উৎসবে। এ উৎসবের স্লোগান ছিল– 'বৈচিত্র্য বহুত্বের ঐকতানে, এসো মিলি সর্বপ্রাণে'। অনুষ্ঠানের ২য় দিন ৩টায় সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। **প্রতিবেদন : মো. জাকির হোসেন**

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর

মহেশখালীর মাতারবাড়িতে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রয়োজনে নির্মাণ হতে যাচ্ছে গভীর সমুদ্রবন্দর। যার ফলাফল দেশ পেতে যাচ্ছে ২০২২ সালের ডিসেম্বরের দিকে। ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে উপকূল থেকে সাগরের দুই কিলোমিটার দূর থেকে ৫৪ ফুট (১৮ মিটার) গভীর হলেও পরবর্তীতে ৭৫০ ফুট চওড়া চ্যানেলের মাধ্যমে সহজেই জাহাজ একেবারে চরের ভেতর প্রবেশ করতে পারবে। ১৮ মিটার ড্রাফট ও কমপক্ষে ২২০ মিটার দৈর্ঘ্যের কমপক্ষে ৮০ হাজার মেট্রিক টনের বেশি ওজনের জাহাজ ভিড়তে পারবে এই বন্দরে। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নির্মাণাধীন এই গভীর সমুদ্রবন্দরে নতুন করে কোনো বিনিয়োগ করতে হবে না। বর্তমান গণমুখী সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়নের সুচিন্তিত ফসল এই মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর– যা আমাদের অর্থনীতির জন্য নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।

বাংলাদেশের পার্বত্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি

মংছেনচীং মংছিন্

বাংলাদেশ একটি শস্য-শ্যামলা, সুজলা-সুফলা নদীমাতৃক দেশ। এই দেশের পূর্বাঞ্চলে আছে বিস্তৃত সবুজ পাহাড় এবং বনাঞ্চল। এই দেশেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি এবং বান্দরবান।
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই পার্বত্য অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পাহাড়ে জুম পদ্ধতিতে আনারস চাষ

বাংলাদেশের অধিকাংশ বনজ সম্পদ এই এলাকাতে অবস্থিত। এছাড়া কাপ্তাই নামক স্থানে দেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং চন্দ্রঘোনায় কাগজের কল রয়েছে। এই অঞ্চল বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে বাস করে তেরোটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জীবনযাত্রা সহজ-সরল। এই তেরোটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা মূলত একই ধরনের তবে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য, সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। পাহাড়ের ঢালুতে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে সেখানে জুম চাষ করা হয়। জুমে ধান থেকে শুরু করে কাপড়ের সুতা পর্যন্ত পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মেয়েরা অত্যন্ত কর্মঠ এবং পরিশ্রমী। তারা নিজেরাই তুলা থেকে সুতা উৎপাদন করে এবং চরকায় সুতা কেটে কাপড় প্রস্তুত করে। চাকমারা গ্রামকে আদাম বলে। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং 'বিঝু' প্রধান উৎসব।
মারমারা সংখ্যায় দ্বিতীয়। তারা বেশিরভাগ বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এলাকায় বাস করে, তাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। তবে যারা শিক্ষিত তারা অনেকে সরকারি চাকরি করে। ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং অন্যান্য দিক দিয়ে তারা উন্নত। মারমা মেয়েরা খুবই পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর হয়। তাদের প্রধান উৎসব হচ্ছে 'সাংগ্রাই'। মেয়েরা কোমরে তাঁতে বোনা লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরে। মারমারা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা বোধিবৃক্ষ পূজা করে।
ত্রিপুরারা সনাতন ধর্মাবলম্বী। তারা খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি এবং বান্দরবান জেলায় বাস করেন। তাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি বা জুম চাষ। বান্দরবান এলাকায় কিছুসংখ্যক ত্রিপুরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। তাদের প্রধান উৎসব বৈসাবি। ত্রিপুরা মেয়েরা নিজেদের তৈরি তাঁতে বোনা কাপড় পরে। এদের পরনের কাপড়কে বলে রিনাই, রিসাই। রুপোর অলংকার তাদের খুবই প্রিয়। তাদের ঘরগুলো বাঁশের মাচা এবং ছনের তৈরি। ত্রিপুরাদের বাঁশি খুবই জনপ্রিয়। তারা সংগীত, নৃত্য এবং শিল্পকলায় খুবই পারদর্শী। তাদের ঐহিত্যবাহী নৃত্য হচ্ছে গড়াইয়া এবং বোতল নৃত্য, যা দেশ-বিদেশের সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। তাদের গ্রামপ্রধানকে বলা হয় 'রোয়াজা'। পাড়ার বিচার-আচার তারাই করে থাকে। যারা শিক্ষিত তারা চাকরি করে।
মুরং, লুসাই ও বম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেকেই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। গো-হত্যা ও নৃত্য মুরংদের প্রধান উৎসব। মুরং পুরুষ ও নারী উভয়ই পরিশ্রমী। তারা অত্যন্ত সমাজবদ্ধ। বর্তমানে অনেকেই শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে চাকমারা তুলনামূলকভাবে বেশি শিক্ষিত এবং সচ্ছলতার কারণে ব্রিটিশ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সরকার থেকে জমিজমা, শিক্ষা ও চাকরি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছে। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা উপজাতিসহ অন্যান্য উপজাতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে অংশগ্রহণ করে। মারমাদের বান্দরবান ও মং সার্কেলে চিফ বা রাজা থাকায় জমি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তারাও অগ্রসর হয়। বর্তমান সরকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, যা পার্বত্যবাসীদের জীবনযাত্রায় গতি এনে দেবে।

মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরের মডেল

গভীর এই সমুদ্রবন্দর সম্পর্কে শিপিং প্রতিষ্ঠান ওওসিএল-এর মহাব্যবস্থাপক ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরে সর্বোচ্চ ১৯০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৯ দশমিক ৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভিড়তে পারে। কিন্তু গভীর সমুদ্র বন্দরে ১২ মিটার ড্রাফটের বেশি ও প্রায় ২০০ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের জাহাজ ভিড়তে পারবে। আর সেসব জাহাজে ৮ থেকে ১০ হাজার একক কনটেইনার নিয়ে জাহাজ ভিড়তে পারবে। চট্টগ্রাম বন্দরে সাধারণত সাড়ে ৪ হাজার একক কনটেইনারের জাহাজ ভিড়ে থাকে। তবে বন্দর কর্তৃপক্ষ যদি চায় তাহলে বেশি কনটেইনারবাহী জাহাজ ভেড়াতে পারবে। প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার কয়লা বিদ্যুৎ নির্মাণ প্রকল্পে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) দিচ্ছে ২৯ হাজার কোটি টাকা ও বাংলাদেশ সরকার দিচ্ছে ৭ হাজার কোটি টাকা।

বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকারের সুযোগ্য নেতৃত্বের ফসল এদেশের জনগণ ভোগ করছে। জাতির পিতার সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকারের বহুমুখী উন্নয়নের প্রচেষ্টার সুফল এই সমস্ত প্রকল্প। জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নের আওতায় গভীর সমুদ্রবন্দরের জন্য জেটি নির্মাণ করা হচ্ছে। আর সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা যাচ্ছে না বলে মাতারবাড়ি দিয়েই গভীর সমুদ্র বন্দরের সুবিধা পাবে দেশের আপামর জনগণ।

প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু

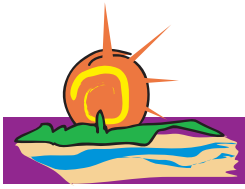

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

পানি ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি ব্যবহারের আহ্বান

দেশের পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৮ জানুয়ারি সুইজারল্যান্ডের ডাভোস কংগ্রেস সেন্টার ওয়ার্ল্ড ইকোনমি ফোরামের ৪৭তম বার্ষিক সভার এক অধিবেশনে তিনি একথা বলেন। 'ওয়াল্ড'স আন্ডারওয়াটার' শিরোনামের এই আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই আলোচনায় জরুরি বিষয় হলো ওয়াটার টেকনোলজি। বাংলাদেশে স্বাদু পানির যে চাহিদা তার ৭০ শতাংশই কৃষিতে লাগে। ধান উৎপাদনে যে পানি লাগে তা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে সমাধান খোঁজা হচ্ছে।

বাংলাদেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতি এবং কৃষিতে রূপান্তরের মাধ্যমে এই খাতে পানির চাহিদা বাড়ছে। অন্যদিকে স্বাদু ও ভূগর্ভস্থ পানির উৎসগুলো ক্রমশ ক্ষয়ে আসছে। এ কারণে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের পুরো প্রক্রিয়ায় পানি সাশ্রয়ী এবং ভিন্ন পরিস্থিতি সামলে টিকে থাকতে সক্ষম প্রজাতি উদ্ভাবনের কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ৪৮ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করবে। সে কারণে আঞ্চলিক পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনায় আরো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পানি নিয়ে যাদের বিশেষায়িত জ্ঞান রয়েছে এবং যারা অর্থ জোগান দেন তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থানীয় ও কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মরতদের যে-কোনো ধরনের অংশীদারিত্ব তৈরিতে সরকারের আগ্রহের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনায় আন্তঃসীমান্ত উৎসগুলোর যথাযথ ব্যবহার, সামুদ্রিক পানি ব্যবহার এবং সব পক্ষের স্বার্থে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বশীল আচরণের কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ জানুয়ারি ২০১৭ সুইজারল্যান্ডে ডাভোসের কংগ্রেস সেন্টারে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভায় Worlds Underwater শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন – পিআইডি

প্রায় অর্ধশত দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রধানদের অংশগ্রহণে ১৭ জানুয়ারি ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভার কার্যক্রম উদবোধন হয়। **প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন**

১০৯২১ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

২৩০ ভূমিহীন পরিবার বাড়ি পেলেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার সারাদেশে একজন মানুষও আশ্রয়হীন থাকবে না– এর অংশ হিসেবে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ২৩০টি ভূমিহীন দুস্থ পরিবারকে বাড়ি উপহার দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ–এক, আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ–দুই, রোস্তম আলী গোলন্দাজ এক নামে তিনটি আশ্রয়ণ প্রকল্পে প্রতি পরিবারকে আড়াই শতাংশ জমিসহ সেমিপাকা বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতি পাঁচটি পরিবারের জন্য একটি করে পাঁচ কক্ষের ব্যারাক, টিউবওয়েল ও টয়লেট নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের জন্য একটি করে পুকুর ও খেলার মাঠ দেওয়া হয়েছে। এখানে কমিউনিটি সেন্টার ও স্কুল নির্মাণ করা হবে। পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের স্বাবলম্বী করার জন্য কৃষি, মৎস্য চাষ, পশু পালন, সেলাইসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণ দেওয়া হবে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

সিদ্ধার্থ শঙ্কর কুণ্ডু। উপজেলার টাঙ্গার ও চরআলগী ইউনিয়নে এ তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি বিল ২০১৬ চূড়ান্ত

পল্লি অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা পল্লির দারিদ্র্য বিমোচন প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত 'বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি বিল ২০১৬'-এর রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে। ৪ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনসহ বিলটি সংসদে উপস্থাপন করা হয়।

সংসদ সচিবালয় থেকে জানা যায় যে, ২০১১ সালে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের রায়ে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশগুলো বাতিল হয়ে গেলে উক্ত আইনটি রহিত হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে উক্ত অধ্যাদেশ বলে গঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনি শূন্যতা সমাধানকল্পে ২০১৩ সালে বাতিল আইনগুলোর কার্যকারিতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে অধ্যাদেশ কার্যকরণ বিশেষ বিধান জারি করেন রাষ্ট্রপতি। গত ২৯ সেপ্টেম্বর আগের অধ্যাদেশ রহিত আইনটি পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে এ বিলটি উত্থাপিত হয়। একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্ডিন্যান্স ১৯৮৬ রহিত পল্লি উন্নয়ন একাডেমি আইন ২০১৬ বিলটি উত্থাপন করেন–স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন। পরে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংসদে রিপোর্ট প্রদানের জন্য বিলটি সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়।

বাণিজ্য মেলায় নারী স্বাস্থ্য, পুষ্টি, অটিজম বিষয়ে পরামর্শ ও সেবাকেন্দ্র

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা মাঠে নিউট্রিশন অ্যান্ড অটিজম রিসার্চ সেন্টার (নার্ক) নারী স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও অটিজম বিষয়ক পরামর্শ ও সেবাকেন্দ্র চালু করেন ১১ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ জানুয়ারি ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৭ উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধী উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যাচ্ছেন। বাজেট প্রণয়নের সময় প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করলে দেশ গঠনে প্রতিবন্ধী সন্তানেরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে। প্রতিবন্ধীরা স্পেশাল অলিম্পিক থেকে স্বর্ণ জয় করে এনে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল করেছে। তাই আমাদের সকলের উচিত প্রতিবন্ধী সন্তানদের অবহেলা না করে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করা। প্রতিবন্ধীরা কোনো মতেই সমাজের অভিশাপ নয় 'আশীর্বাদ'।

প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

বিমানবন্দর থেকে ঝিলমিল বাস ট্রানজিট নির্মাণ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে তিন ধাপে নির্মাণ করা হবে রাজধানীর বিমানবন্দর থেকে কেরানীগঞ্জের ঝিলমিল প্রকল্প পর্যন্ত প্রায় ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) রুট-৩। ইতোমধ্যেই এই প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই ও পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এ মাসেই বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) স্টেশনের মডেল

দল ঢাকা সফর করে প্রকল্পটির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে চুক্তি করবে। সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মোট তিন ধাপে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। প্রথম ধাপে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মহাখালী পর্যন্ত। দ্বিতীয় ধাপে মহাখালী থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত। আর তৃতীয় ও শেষ ধাপে নির্মাণ হবে গুলিস্তান থেকে ঝিলমিল প্রকল্প পর্যন্ত। বিমানবন্দর থেকে মহাখালী পর্যন্ত সড়কে যাত্রী উঠানামার জন্য মোট ৫টি স্টেশন থাকবে। মোট ১৩০টি আর্টিকুলেটেড বাস এই করিডরে চলাচল করবে। এই প্রকল্পের আওতায় মহাখালীতে শুধু বিআরটি বাস চলাচলের জন্য একটি ফ্লাইওভার এবং মহাখালী এবং কেরানীগঞ্জে দুটি ডিপো নির্মাণ করা হবে।

বিমানবন্দর গাজীপুর বিআরটি লেন-এর কাজ শুরু

ঢাকা-গাজীপুরের দূরত্ব মাত্র ২০ মিনিটে নিয়ে আসতে সরকারের 'গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট' প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগুচ্ছে। চীনের একটি প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) বাস্তবায়নের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়।

আর এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সড়কে দ্রুত চলাচলের জন্য পৃথক দুটি লেনে বাস চলাচল করবে। তখন গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসতে সময় লাগবে মাত্র ২০ মিনিট। স্বল্প খরচে দ্রুততার সঙ্গে যাতায়াত নিশ্চিত করতে উন্নত বিশ্বের আদলে বিরতিহীন আলাদা লেনে বাস সার্ভিস চালুর এমন কাজ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো করা হচ্ছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে মাঝের আইল্যান্ডের দুই পাশে নির্মিত হবে এ বিশেষ লেন। গ্রেটার ঢাকা সাসটেনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর এয়ারপোর্ট) শীর্ষক প্রকল্পটি মোট

চারটি প্যাকেজের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিপ্তরের মাধ্যমে যৌথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশ সরকারের এ প্রকল্পে সহযোগী সংস্থা হিসেবে রয়েছে–এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি, ফরাসি উন্নয়ন সংস্থা (এএফডি), গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ)।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

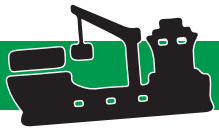

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশীয় পাটখড়ির কার্বন রপ্তানি হচ্ছে চীনে

দেশের পাটখড়ি থেকে তৈরি কার্বন পাউডার বা চারকোল রপ্তানি হচ্ছে চীনে, যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে পাটখড়ি থেকে কার্বন তৈরির ২৫টি কারখানা গড়ে উঠেছে। বেড়েছে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানও। বাংলাদেশ চারকোল উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি (প্রস্তাবিত) সূত্র মতে, এ খাত থেকে বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে ১৫০ কোটি টাকা। বছরে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। পাট অধিদফতরের সূত্র মতে, দেশে বছরে

পাটখড়ি থেকে তৈরিকৃত চারকোল

পাটখড়ি উৎপাদন হয় ৩০ লাখ টন। এর ৫০ শতাংশকেও যদি কার্বন করা যায় তাহলে দেশে বছরে উৎপাদন দাঁড়াবে ২ লাখ ৫০ হাজার টন। এ খাত থেকে বছরে রপ্তানি আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে ৩২ কোটি ২৫ লাখ ডলার। আর সরকার এ খাত থেকে বছরে রাজস্ব পাবে ৪০ কোটি টাকা।

রাসায়নিক পদার্থের জন্য আলাদা শিল্পনগরী গড়ে তোলার উদ্যোগ

শিল্প উৎপাদনে ব্যবহৃত কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থের জন্য একটি আলাদা কেমিক্যাল শিল্পনগরী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত ১১ জানুয়ারি রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত 'উন্নয়ন মেলা ২০১৭'-এর সমাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, ইতোমধ্যে এ শিল্পনগরীর জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। রাজধানীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কেমিক্যাল কারখানাগুলো এতে স্থানান্তর করা হবে। তিনি আরো জানান, পরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের পথে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান ৩০ দশমিক ৪২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশের মোটরসাইকেল রপ্তানি হচ্ছে নেপালে

দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নেপালে মোটরসাইকেল রপ্তানির মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করল দেশীয় মোটরসাইকেল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 'রানার' অটোমোবাইলস লিমিটেড। গত ২১ জানুয়ারি বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ময়মনসিংহের ভালুকায় রানার কারখানায় এ রপ্তানির শুভ সূচনা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল। রানার প্রথমবারের মতো মোটরসাইকেল রপ্তানি করছে, যা গর্বের। এটি বাংলাদেশের রপ্তানি ইতিহাসে নতুন মাইলফলক। মোটরসাইকেল শিল্পকে রপ্তানিমুখী করার জন্য আগামী অর্থবছরে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের নগদ সহায়তা দেওয়া হবে বলে মন্ত্রী জানান।

এগিয়ে যাচ্ছে দেশীয় প্লাস্টিক শিল্প

বাংলাদেশের প্লাস্টিক খাত ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ইতোমধ্যে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে এটি। প্লাস্টিক রপ্তানিতে গত অর্থবছরে এসেছে ৭০০ কোটি টাকার বেশি। এমনকি চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের প্রবৃদ্ধিও স্বস্তিদায়ক। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সূত্রে জানা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে অর্থাৎ জুলাই থেকে ডিসেম্বরে প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানিতে ৪৫ দশমিক ০৮ শতাংশ আয় বেড়েছে। এ সময় দেশ থেকে মোট ৬ কোটি ৪৩ লাখ ৩০ হাজার ডলারের প্লাস্টিক রপ্তানি হয়েছে যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪৬ শতাংশেরও বেশি।

চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েছে

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১ দশমিক ৯৩ শতাংশ যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ বেশি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ১১৬ কোটি ৯ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২২ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে জুলাই-ডিসেম্বর মেয়াদে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫৭ কোটি ২৬ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে চামড়া রপ্তানি খাতে আয় হয়েছে ৬২ কোটি ৭৮ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪ হাজার ৯৯৯ কোটি টাকা।

প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে প্রতিবন্ধীদেরও সমান অধিকার

দেশের জনগোষ্ঠীর একটি অংশ প্রতিবন্ধী। সমাজে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে বিধায় প্রতিবন্ধীরা অবহেলিত। প্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবকরা নানারকম মানসিক সমস্যায় ভোগেন। একসময় প্রতিবন্ধিতার কারণ নিয়ে মানুষ অন্ধকারে ছিল এবং নানারকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। এটা জানা জরুরি যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রয়েছে অন্য সবার মতোই শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের সমান অধিকার।

বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ

প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে সরকারের নীতি এবং জাতীয় কর্মকৌশল রয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজ সেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধীত্বের ধরন ও মাত্রাসহ প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ সম্পন্ন করেছে। ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ ১৫.১০ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তালিকা তৈরি করেছে এবং তাদের তথ্যাদি Disability Information system-এ এন্ট্রি করেছে এবং ১০.০১ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র প্রদান করেছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য রয়েছে শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রতিবন্ধী ভাতা।

এগুলো সম্পর্কে সকলকে জানাতে হবে। সরকার প্রতিবন্ধীদের আন্তর্জাতিকমানের সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছে। সন্তান প্রতিবন্ধী হলে হীনমন্যতায় ভোগার কোনো কারণ নেই। প্রতিবন্ধী শিশুকে সমাজে চলাফেরা ও খাপ খাওয়ানোর উপযোগী করে তুলতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুরা অভিভাবকদের সাহসী করে তুলতে সক্ষম হয়।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশু সুরক্ষায় কমিটি করবে সরকার

শিশু সুরক্ষায় দেশের প্রতিটি ওয়ার্ডে সমাজভিত্তিক কমিটি গঠন করবে সরকার। ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর বা মহিলা সদস্যকে সভাপতি করে এই কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ থেকে শুরু করে শিশুদের স্কুলগামী করতে এবং সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে কাজ করবে। কোনো শিশুর ওপর যৌন নির্যাতন ও যৌন শোষণসহ শিশু পাচার সম্পর্কিত তথ্য পুলিশকে জানাবে এ কমিটি। এছাড়া শিশুর ওপর শারীরিক ও মানসিক শাস্তির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে সচেতনতা বাড়াতেও কাজ করবে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুর পরিবার যাতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সরকারের নানা সেবা পায়, সেজন্য এই কমিটি সহায়তা করবে।

এসব বিধান রেখে 'শিশু আইন ২০১৩' সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মৃত্যুঞ্জয় সাহা স্বাক্ষরিত খসড়াটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বাল্যবিবাহকে ১৬ লাখ শিক্ষার্থীর লাল কার্ড

১ লাখ ১৪ হাজার ৩২৩ শিক্ষার্থী একসঙ্গে বাল্যবিবাহকে লাল কার্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের বিরোধিতা প্রকাশ করেছে। ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে সুনামগঞ্জের ১১টি উপজেলার সবকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এই লাল কার্ড প্রদর্শনীতে অংশ নেয়।

লাল কার্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে এত মানুষ একসঙ্গে বাল্যবিবাহের বিরোধিতা প্রকাশ করা বিশ্বে এটাই প্রথম। তাই এটি গিনেস বুকে স্থান পেলেও পেতে পারে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের। সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

পথশিশুদের পুনর্বাসনে সরকারি উদ্যোগ

পথশিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'পথশিশু পুনর্বাসন কার্যক্রম' গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এখানে পথশিশুদের জন্য শেল্টার হোম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদেরকে প্রশিক্ষণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, উন্মুক্ত স্কুলসহ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রমে সংযুক্ত করা হচ্ছে। মেয়েশিশুদের জন্য আজিমপুরে এবং ছেলেশিশুদের জন্য কেরানীগঞ্জ ও গাজীপুরে একটি করে তিনটি কেন্দ্রসহ মোট ৬টি শিশু বিকাশ

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ নারীদের মাঝে ভিজিডি কার্ড বিতরণ করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি

কেন্দ্র বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ৩০ জানুয়ারি মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি জাতীয় সংসদে এসব কথা জানান। **প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন**

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

ডব্লিউইএফ সভায় প্রধানমন্ত্রী

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ৪৭তম বার্ষিক সভায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ প্রায় অর্ধশত দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান অংশ নিয়েছেন। ১৭ জানুয়ারি সুইজারল্যান্ডের ডাভোস শহরের কংগ্রেস সেন্টারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বৈঠকের স্লোগান– 'রেসপনসিভ অ্যান্ড রেসপনসিবল লিডারশিপ'। ধনীদের বার্ষিক আলোচনা সভা নামে পরিচিত এ ফোরামের নির্বাহী চেয়ারম্যান ক্লস-এর আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী এবারের বার্ষিক সভায় যোগ দেন।

প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড ২০১৭ খসড়া প্রণয়ন

দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি প্রায় এক কোটি প্রবাসীর আয়। এই প্রবাসীদের কল্যাণে একটি বোর্ড গঠনে আইন প্রণয়ন

করছে সরকার। এতে প্রবাসে কোনো বাংলাদেশি মৃত্যুবরণ করলে সরকারি ব্যয়ে মরদেহ দেশে নিয়ে এসে বাড়িতে পৌঁছানো এবং শেষ আনুষ্ঠানিকতার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। মৃতুবরণকারীর পরিবার অসচ্ছল হলে অনুদানেরও ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। একই সঙ্গে বিদেশে অসুস্থ, আহত ও শারীরিকভাবে অক্ষম প্রবাসীদের দেশে এনে চিকিৎসা সহায়তাও দেবে ঐ কল্যাণ বোর্ড। আইনের খসড়ায় নারী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য বিদেশে নারী শ্রমিকদের জন্য সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। দেশে ফেরত নারী অভিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচি গঠন এবং অর্থায়ন করবে বোর্ড। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব কথা জানা যায়।

উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

আগামী বছরগুলোতে যেসব দেশে উচ্চ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে, সেগুলোর তালিকায় বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপারস (পিডব্লিউসি)। এই বহুজাতিক নিরীক্ষা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের উইনিং ইন ম্যাচুরিং মার্কেট শীর্ষক ২০১৭ সালের এক প্রতিবেদনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবদ্ধি ৭ শতাংশ হবে বলে ধরা হয়েছে। অবশ্য গত অর্থবছরেই জিডিপি ৭ শতাংশ ছাড়িয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীন ও ভারত সম্ভাবনাময় বাজার। এ দেশ দুটোয় আমেরিকার চেয়ে বেশি হারে প্রবৃদ্ধি হবে। ইউরোপ ও জাপানে আগামীতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে। আর ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, পোল্যান্ড ও মিসরের সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিবাচক উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি হবে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, প্রযুক্তির ব্যবহার ও সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, লেনদেন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, বীমা খাতের কার্যক্রম বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নসহ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেড়েছে। এতে বাংলাদেশের মানুষের ব্যয়ের ক্ষমতা বাড়ছে, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও উৎপাদন দুটিই বৃদ্ধি করছে।

ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফর

ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস তিনদিনের সফরে ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আসেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের আমন্ত্রণে তিনি এ সফরে আসেন। সফরকালে মাহমুদ আব্বাস জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন ও জাতীয় জাদুঘর ঘুরে দেখেন। এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। **প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াছমিন**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তাঁর কার্যালয়ে সফররত ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস সাক্ষাৎ করেন –পিআইডি

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

রেইনবো ফিল্ম সোসাইটির আয়োজনে জাতীয় জাদুঘরে 'পঞ্চদশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসব ১২ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। 'নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ'–স্লোগানের এই উৎসবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৬৭টি দেশের ১৮৮টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে– ভারত,

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১২ জানুয়ারি ২০১৭ জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

আফগানিস্তান, ইরান, জার্মানি, শ্রীলঙ্কা, কাতার, ফ্রান্স, মঙ্গোলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, গ্রিস, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, চীন, নেদারল্যান্ড, পাকিস্তান, কিউবা, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ইরাক, নরওয়ে, সৌদি আরব, তুরস্ক, মিসর, থাইল্যান্ড, পোল্যান্ডসহ ৬৭টি দেশ। জাতীয় জাদুঘর, কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন ও বসুন্ধরার স্টার সিনেপ্লেক্স ভেন্যুতে একযোগে প্রদর্শিত হয় উৎসবের চলচ্চিত্রগুলো।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুদান সহায়তায় এই উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। এশিয়ান কমপিটিশন, সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড সেকশন, চিলড্রেনস ফিল্ম সেকশন, স্পিরিচুয়াল ফিল্ম, উইমেন ফিল্ম মেকার সেকশন, শর্ট অ্যান্ড ইনডিপেনডেন্ট ফিল্ম সেকশন ও নরডিক ফিল্ম সেকশন–এই ৭টি বিভাগে প্রদর্শিত হয় উৎসবের চলচ্চিত্রগুলো।

ঢাকা-কলকাতা চলচ্চিত্র বিনিময়

ঢাকা আর কলকাতার মধ্যে আবারো চলচ্চিত্র বিনিময় হলো। ঢাকার ছবি 'সম্রাট' এর বিনিময়ে কলকাতা থেকে এল 'অভিমান'। ২৩ ডিসেম্বর কলকাতার আশপাশের তিনটি সিনেমা হলে মুক্তি পায় মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ পরিচালিত শাকিব খান-অপু বিশ্বাস অভিনীত 'সম্রাট' ছবিটি। এ ছবির বিনিময়ে আমদানি করা হয় কলকাতার নির্মাতা রাজ চক্রবর্তী নির্মিত জিৎ, সায়ন্তিকা ও শুভশ্রী অভিনীত 'অভিমান' ছবিটি, মুক্তি পায় ঢাকাসহ সারাদেশে ৩০ ডিসেম্বর।

সরকারি অনুদানে দুই ছবি

সরকারি অনুদানের দুই ছবিতে অভিনয় করেছেন এক সময়ের আলোচিত চিত্রনায়িকা মুনমুন। ছবিগুলো হলো- দেলোয়ার জাহান ঝন্টুর '৫২ থেকে '৭১ এবং ড্যানি সিডাকের 'কাসার থালায় রুপালী চাঁদ' এই ছবি দুটো সরকারি অনুদানে নির্মিত হয়েছে।

২০১৬ সালের সেরা ১০ ছবি

১. অজ্ঞাতনামা, ২. শঙ্খচিল, ৩. কৃষ্ণপক্ষ, ৪. আয়নাবাজি, ৫. শিকারি, ৬. বাদশা, ৭. মেন্টাল, ৮. সম্রাট, ৯. রক্ত, ১০. বসগিরি।

প্রতিবেদনঃ মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

আরচারিতে বাংলাদেশের স্বর্ণালি দিন

১ম আন্তর্জাতিক সলিডারিটি আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপে স্বাগতিক বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। সম্প্রতি ১৪ জাতির টুর্নামেন্টে অন্তত ৬টি স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশের আরচাররা।

বাংলাদেশের ৫টি স্বর্ণ এসেছে দলগত ইভেন্ট থেকে, একক ইভেন্টে একমাত্র আরচার হীরামণি আজরাবাইজানের রমজাসোভাকে হারিয়ে শিরোপা অর্জন করেন। এছাড়া টুর্ণামেন্টে একটি রুপা ও ২টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৯টি পদক অর্জন করে বাংলাদেশ। আরচারির ইতিহাসে স্মরণকালের সেরা আন্তর্জাতিক সাফল্য এটা।

অনূর্ধ্ব ১৬ নারী ফুটবলারদের শুভ সূচনা

সম্প্রতি জাপান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় জাপানের ওসাকা শহরে অনুষ্ঠিত হয় জে. গ্রিন সাকাই নারী ফেস্টিবল অনূর্ধ্ব ১৬। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের নারী ফুটবলাররা কৃতিত্বের সাথে জাপানে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে দারুণ পারফরমেন্স করেছে। বাংলাদেশের কৃষ্ণা, সানজিদা, মার্জিয়া, সাকিরা, স্বপ্নারা মোট ৭টি ম্যাচে অংশ নিয়ে ৪টিতে গৌরবদীপ্ত জয়, ১টিতে ড্র এবং ২টি ম্যাচে হেরেছে। জাপানের এই ফেস্টিবলে জাপানের ১৮টি দলের সঙ্গে অংশ নেয় বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড।

বর্ষসেরা পুরস্কার পেলেন মোস্তাফিজ ও শিলা

বর্ষসেরা পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রিকেটার মোস্তাফিজ ও সাতারু শিলা

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পুরস্কার 'স্কুল বিএসপিএ স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড' গত দুই বছরের বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদদের পুরস্কার পেয়েছেন ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমান ও সাতারু মাহফুজা খাতুন শিলা। ২০১৫ সালে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের স্বীকৃতি হিসেবে এ পুরস্কার পান মোস্তাফিজ। ২০১৫ সালের জুনে এ ক্যাটাগরিতে মনোনীত হয়েছিলেন–মাহমুদুল্লা রিয়াদ ও সৌম্য সরকার। সাউথ এশিয়ান গেমসে স্বর্ণজয়ের জন্য ২০১৬-এর বর্ষসেরা খেলোয়াড় স্বীকৃতি পান জলকন্যা শিলা। কাটার মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমান আরো একটি পুরস্কার পান–দর্শকদের ভোটে ২৫ হাজার ভোট পেয়ে পপুলার অ্যাওয়ার্ড পান মোস্তাফিজ। সোনারগাঁও হোটেলের হল রুমে এ পুরস্কার তুলে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত।

বঙ্গবন্ধু কাপ ফুটবলে শেখ রাসেল চ্যাম্পিয়ন

মাগুরার মুক্তিযোদ্ধা আছাদুজ্জামান স্টেডিয়ামে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনাল খেলায় ঢাকা শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র লিমিটেড ট্রাইবেকারে ৫-৪ গোলে বাংলাদেশ

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হাতে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের খেলোয়াড়দের উল্লাস

নৌবাহিনী ফুটবল দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ ও আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের নির্ধারিত ৯০ মিনিট গোলশূন্যভাবে শেষ হলে খেলা ট্রাইব্রেকারে গড়ায়। টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের ফুটবলার অরুপ কুমার বৈদ্য। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. বীরেন শিকদার এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী দলের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন। **প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী**